শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

অ্যালবাম

বার্ষিক পত্রিকা

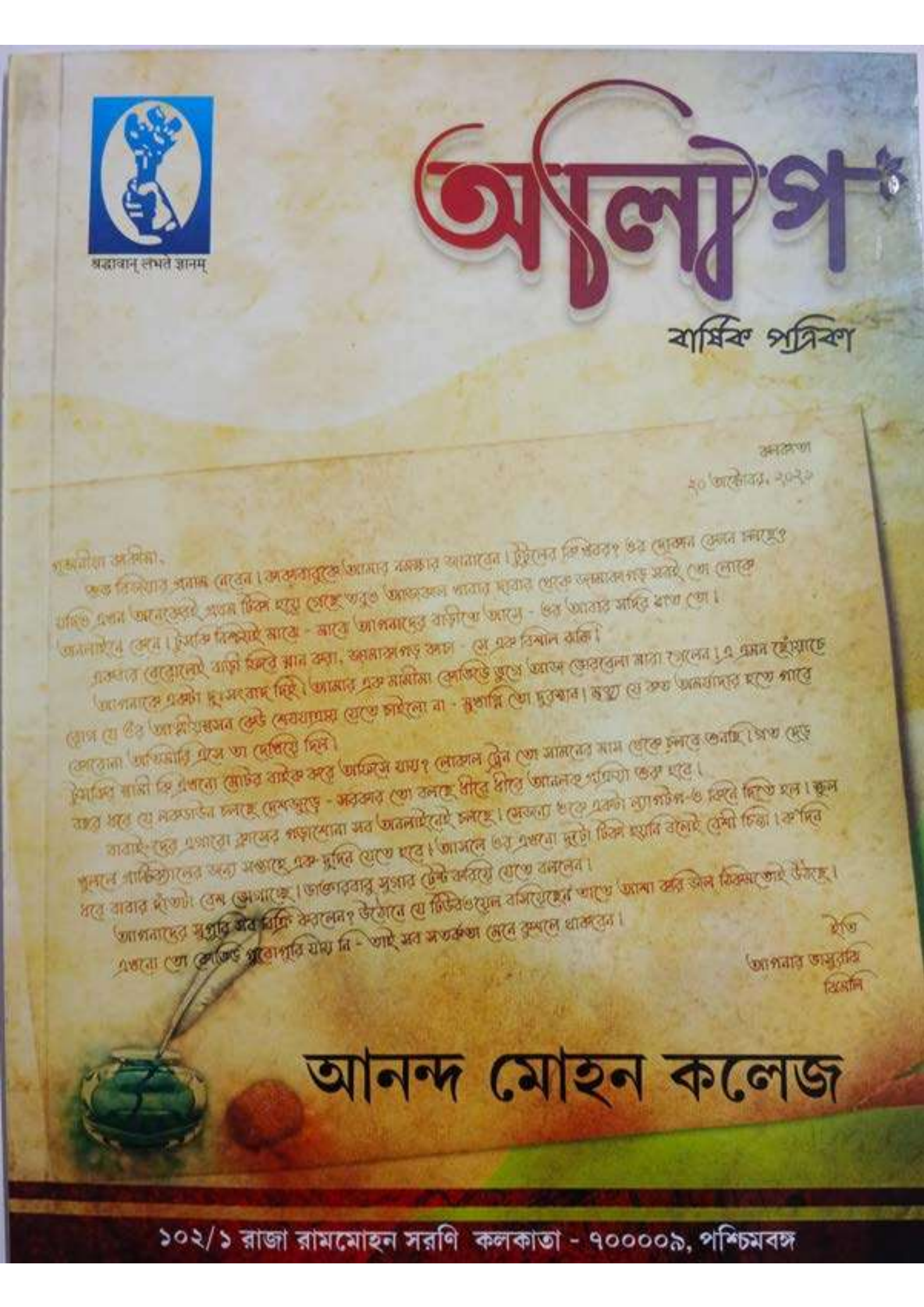

আনন্দ মোহন কলেজ

১০২/১ রাজা রামমোহন সরণি কলকাতা - ৭০০০০৯, পশ্চিমবঙ্গ

অলিন্দ

বার্ষিক পত্রিকা

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

আনন্দ মোহন কলেজ

১০২/১ রাজা রামমোহন সরণি

কলকাতা - ৭০০০০৯, পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ - মিলি দাস

সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রী আনন্দ মোহন বসু

জন্ম ঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭

মৃত্যু ঃ ২০শে আগষ্ঠ, ১৯০৬

আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির প্রাক্তন সভাপতি ড. কোরক কান্তি চাকির স্মরণে এই পত্রিকা উৎসর্গীকৃত হলো। আমাদের সমস্ত কর্মকান্ডে তাঁর সহায়তা ও উৎসাহদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ও বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

অধ্যক্ষ
শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দ
অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
আনন্দমোহন কলেজ

অধ্যক্ষের কথা

হৃদয় গভীরে শিকড়ের মতো ছড়িয়ে গিয়েছে অক্ষরমালা। দীর্ঘ সময়ের আড়াল সরিয়ে পূব দিগন্তের প্রস্ফুটিত আলোয় বেজে উঠেছে ভৈরবী 'আলাপ'। গুণীজনের কালির আঁচড়ে ব্যক্ত হয়ে উঠল নতুন দিনের অনুভব। বহু বিচ্ছেদ বেদনায় নীল হয়ে ওঠা ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে কত প্রিয়জনের স্মৃতি রোমন্থন করে 'আলাপ' আবারও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে চায়। আমাদের কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সদাহাস্যোজ্বল অধ্যাপক কোরককান্তি চাকীকে হারিয়ে আজও আমরা শোকস্তব্ধ, নির্বাক ও বিচলিত। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রবল শোকের মধ্যে অতিমারির বাধার পাহাড় সরিয়ে প্রিয় ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের সকলের যোগে 'আলাপ' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। যাঁদের নিরলস নিষ্ঠায়-শ্রমে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমার অন্তরের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।

ড. প্রদীপ কুমার মাইতি
অধ্যক্ষ

সম্পাদকের কথা

কোভিড-১৯ অতিমারিতে সারা বিশ্ব আজ যখন বিপন্ন, তখন কলকাতার একটি সান্ধ্য কলেজ থেকে বছর চারেক পরে কলেজ-পত্রিকা 'আলাপ' প্রকাশের প্রাক্কালে আমরা অভিভূত।

বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর মিছিলের আবহে ছাত্র, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের অভূতপূর্ব উৎসাহ এবং নিরলস প্রয়াস যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

এবছরের পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা ছাড়াও ছাত্রদের আঁকা বেশ কিছু ছবি আমাদের পরম প্রাপ্তি।

পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে সমস্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষকদের কাছে এই আমার চাওয়া যে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও তাঁরা যেন তাঁদের সৃষ্টিশীল সত্তাকে সদাসর্বদা জাগ্রত রাখেন।

শৌভিক বসু রায়
বিজ্ঞান বিভাগ

সূচীপত্র

কবিতা	
লিমেরিক - অধ্যাপক শুভায়ন বসু	4
আমাদের শ্রাবণ - পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	4
দুটি কবিতা - সুচরিতা মাজী	5
শিক্ষক - তন্ময় ভৌমিক	6
রূপক - অনন্যা দাশগুপ্ত	6
তিনটি কবিতা - দেবাশিস গাঙ্গুলী	7
পথের বাঁকে - সুভাষ রায় চৌধুরী	8
গদ্য, প্রবন্ধ ও গল্প	
রোজনামচা - প্রিয়তোষ দত্ত	11
রবীন্দ্রনাথের গান - সন্দীপন সেন	21
মাটির দুর্গা - অনন্যা দাশগুপ্ত	24
শান্তির দূত বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং - তপনকুমার মৈত্র	25
শোভা সিং ; বর্ণ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস ও বাগদি কৃষক বিদ্রোহ - মিলন রায়	28
এক তরুণের লেখক হওয়ার গল্প - তুষার পাত্র	32
परम्परागत बेड़ियों को तोड़ती स्त्री की संघर्षगाथा: कस्तूरी कुण्डल बसै - डॉ रीना कुमारी	33
English Articles	
English, the humanities and the Indian scenario - Dibyajyoti Ghosh	38
Cryptozoology : Science or Fiction - Pallab Ray	42
Conservation of Nature : The Story of Bhutan - Sounak Dutta	43
Yoga & You - Prabir Das	46
Mother can make a difference - Naru Gopal Roy	47
I HAVE SEEN IT - Subhodeep Chakraborty	47
Hair Fall - Ananya Chakraborty	48
WHAT IS LIFE - Subhodeep Chakraborty	51
Save trees, Please - Mahi Shaw	52
Cherry & Jerry - Sankalp Anand	52
The Essence of Love - Ananya Das Gupta	53

লিমেরিক

শুভায়ন বসু
অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

চেষ্টা

স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্‌ কামারের এক ঘা
এতো করি মক্‌সো কিছুইতো মেলে না
তবু করি চেষ্টা
যদি মেলে কেষ্টা
নিজেকেই বলি আমি চেষ্টা চালিয়ে যা।

সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে

সূর্য নাকি পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে
দেখবে যদি চলে এসো ধর্মতলার মোড়ে
ল্যাম্পপোষ্ট দেয়ালে
কে. সি. দাশের খেয়ালে
সত্য যেথা সরে গেছে শত যোজন দূরে।

সরিষার ভূত

বড়িশার হরি শাহর সরিষার কারবার
উত্তরে টালা থেকে ডায়মণ্ডহারবার
একদা নিশীথ রাতে
ভূত দেখে সরিষাতে
লম্বা লম্বা পায়ে গেলেন পগার পার।

আমাদের শ্রাবণ

পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সাম্মানিক বাংলা

এক বৃষ্টি ভেজা কাক,
চিলেকোঠার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল,
আর তুমি দেখছিলে,
দশতলা বিলাসিতা জানলার ওপার দিয়ে।

এক ফুটপাতের শিশু শ্রাবণ দেখ্‌ছিলো,
জলে ভেসে যাওয়া ফুটপাথের ঘরে।
আর তুমি দেখছিলে,
হাতবন্দি মুঠোফোনের জানলা দিয়ে।

এক ক্লান্ত মজুর বর্ষা দেখেছে,
বৃষ্টিভেজা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে।
আর তুমি দেখছিলে
কালো কাঁচতোলা রক্তচোষা গাড়িতে বসে।

তোমার শ্রাবণ বাইশে শ্রাবণ বানে
ওদের শ্রাবণ দুবেলার ভাতে হার মানে।
তোমার বর্ষা, ইলিশের ছড়াছড়ি
ওদের বর্ষা যন্ত্রণার মারামারি।

হাড় হিম করা লজ্জিত সমাজ,
ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে।
তোমার মানসিকতাই শুধু,
আর এক নতুন সমাজ গড়তে পারে।

দুটি কবিতা

সুচরিতা মাজী
সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা

বসুন্ধরার আর্তনাদ

বসুন্ধরা যেন চিৎকার করে বলছে.......
তোমরা মানবজাতি, তোমরা এই প্রাণী-জগতের সবথেকে উন্নত,
অথচ তোমরা প্রতিনিয়ত আমায় করে চলেছ ক্ষত-বিক্ষত।
'একটি গাছ, একটি প্রাণ' - এটা না কি তোমাদের শ্লোগান।
অথচ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তোমরা কেড়ে নিচ্ছ শত শত গাছের প্রাণ।
গাছকে উপড়ে ফেলে, তোমরা গড়ছ নগরায়ন,
তোমাদের জন্যই বেড়ে চলেছে বিশ্ব উষ্ণায়ন।
বিভিন্ন উপায়ে তোমরা আজ দুষিত করছো বায়ু,
আদতে, তোমরা কমিয়ে দিচ্ছ নিজেদেরই আয়ু।
বিশ্ব পরিবেশ দিবস - বছরের ওই একটি দিনে তোমরা ভাবো আমার কথা,
একটি চারাগাছ রোপণের মাধ্যমে, তোমরা যেন ঘোচাতে চাও আমার ৩৬৪ দিনের ব্যথা।

আমাদের সত্যজিৎ

ফরাসি চিত্র পরিচালক জঁ রেনোয়ার
অনুপ্রেরণা,
তোমার জীবনে ঘটালো এক নতুন দিনের সূচনা।
তোমার হাত ধরে শুরু হল নতুন সিনেমা সৃষ্টি,
'পথের পাঁচালী' উপন্যাস পেল সিনেমা রূপে মুক্তি।
'পথের পাঁচালী'-র অপুকে তুমি
'অপরাজিত' হিসেবে নবনির্মাণ করেছ
'অপুর সংসার'-এ,
কখনও আবার 'পরশপাথর' হাতে নিয়ে
প্রবেশ করেছ তোমার 'জলসাঘর'-এ।
'ঘরে-বাইরে','প্রতিদ্বন্দ্বী' কিংবা 'তিনকন্যা',
ফেলু মিত্তিরকে 'নায়ক' করে তুমি গড়েছ
'জয় বাবা ফেলুনাথ' এবং 'সোনার কেল্লা'।
শুধু সিনেমা কেন-গানেও তোমার জুড়ি মেলা ভার.......
তাইতো ১৯৯২-তে
'lifetime achievement'-এর জন্য
তুমি পেয়েছ অস্কার।
কোনো কিছুতেই মেটানো যায় না তোমার অমূল্য সৃষ্টির
দাম..........
তাইতো বাঙালির চিত্ত
আজও, তোমায় স্মরণ করে বলে ওঠে
'মহারাজা তোমারে সেলাম'।।

শিক্ষক

তন্ময় ভৌমিক
সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা

শিক্ষক মানে মনুষ্যত্ব
আছে যেথায় প্রজ্ঞার সম্ভার,
শিক্ষক মানে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব
মন মধ্যস্থ সর্বদা সদাচার।।

শিক্ষক মানে কটূক্তি বিরোধী
গূঢ় ঘনীভূত কালো অন্ধকারে আলো,
শিক্ষক মানে ছাত্রছাত্রী দরদী
দীপ্ত সূর্যালোকে আশার প্রদীপ জ্বালো।।

শিক্ষক মানে ছাত্রছাত্রীদের মনের গভীর
তেজোময় মুখমন্ডলে জ্ঞানচিত্ত আধার,
শিক্ষক মানে সমাজে উচ্চ যেথা শির
যার প্রকৃত অর্থ সমাজ গড়ার কারিগর।

শিক্ষক মানে সহৃদয়তা সম্পন্ন
সমস্ত বিষয়ে সকলকে সমান গুরুত্ব,
শিক্ষক মানে সর্বদা শিক্ষার্থীদের জন্য
ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত বোধিসত্ত্ব।।

শিক্ষক মানে স্কুলের গতানুগতিক পরিবেশ
সমাজের কোনো ভয়হীন সাহসী এক বীর,
শিক্ষক মানে শিক্ষার্থীদের প্রতি চৌম্বক আবেশ
যার হাতে সহজেই ছিন্ন কুসংস্কারের জঞ্জির।।

রূপক

অনন্যা দাশগুপ্ত
সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা

তোমার দিগন্তে বিস্তৃত হোক লাল পলাশের মেলা
শরৎ হাওয়ায় দোল দিয়ে যায় কাশফুলের ওই ভেলা;
ভাসান গানের মাঝিটারে আজ বড্ড মনে পড়ে
ভাসিয়ে দিত সুরের তরী কৃষ্ণচূড়ার পরে।
সাগর তলে হাজার ঝিনুক মুক্তো জমা রাখে
কল্পনাতে ডুবুরিরা সপ্ত সিন্ধু ঢাকে,
সিঁথির সিঁদুর রাঙিয়ে বধূ সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালে
রাঙামাটির পথের বাঁকে, সূর্য গেছে অস্তাচলে।
রাত বাড়লেই রোয়াক গুলো হারায় কোলাহল
রাতের আকাশ তারার মাঝে স্বপ্নেরা খোঁজে ছল।
জাগিয়ে তোমার ঘুমের নেশা, সকাল হল শুরু-
মিষ্টি রোদে, সিক্ত চুলে, প্রেমিকের বুকটা দুরুদুরু।
কোকিল গুলো গান গেয়ে যায়, মেঘবালিকার কাছে;
তোমার আমার স্বপ্নগুলো প্রাণহীনতায় বাঁচে।
বাস্তবতার রূপকখানি রূপকথারই মতো -
সেইখানেতে যুদ্ধ লাগে, হেথায় মানসিক ক্ষত।
স্বপ্ন বুঝি জিয়নকাঠি, ছোঁয়ালেই বিপর্যয়
মানবধর্ম করব ভাবি, ভাবি সময় অপচয়;
রাজতন্ত্রের মাৎস্যন্যায়, গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি

বিলুপ্তপ্রায় মানসম্মান, মিথ্যে বুলি খাঁটি।
মরবে শুধু উলু-খাগড়া, কঠিন কেবল বাঁচা
শিক্ষা দীক্ষা, ধুর ছাই, শুধু বেকারত্বের খাঁচা!
সেই তো ঘুষেই আটকে যাবে, বাবার দেওয়া শ্রম,
তবু আমাদের মুখে কুলুপ, চোখের মধ্যে ভ্রম,
স্বপ্ন আর বাস্তবের তফাতখানা দেখো-
একজন সিন্ধু তো অন্যটা হিমালয়ের মতো।

বর্তমানের জীবনখানি লাগেই কেবল বোঝা
তারই মধ্যে মধ্যবিত্তের স্বপ্ন চলে খোঁজা,
বলতে তো চাই অনেক কিছুই, অভিযোগ অফুরন্ত-
বাস্তবতার ছাঁচে এখন আমিও হয়েছি রপ্ত,
শেষ করলাম কলমখানি, এটুকু বলেই রাখি
নীল দিগন্ত স্বপ্ন দেখায়, মেঘেরা দেয় ফাঁকি।।

তিনটি কবিতা

দেবাশিস গাঙ্গুলী
হিসাবরক্ষক, অর্থদপ্তর

আঁতের কথা

একি এক কাণ্ড
আজ করছ খোদাতালা
এমন রসের দুনিয়া জুড়ে
তোমার এ কি ছলাকলা।
এমন দিনও আইল আজ দুনিয়ায়
ঈদে খুশির আজান উঠবে
শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায়?

এসব শুনি তিথির ব্যাপার
মানুষের নাই হাত
তবে কি বলব
তাদের তিথিতে, আমার তিথিতে
নাই কোন বিবাদ?
মানুষের হাতেই কি বিবাদ তবে,
করবে স্বীকার মানুষ?
কি জানি বাবা জগৎজুড়ে
ওঠে তর্কের ফানুস।

খোদা-ভগবান
হেসে গড়াগড়ি খান,
দেখে মানুষের কান্ড।
টিকি আর দাড়ি
করে মারামারি
আসলে দুটোই ভন্ড।

সবাই না কি আমারে বুঝেছে
আজানে আর ঘন্টায়!
একথা বোঝাতেই
অনেকে জীবন কাটাল
আমি মিথ্যা, অর্থহীন
আমি বন্দী শুধু
ধর্মের খাঁচায়।
শোন ওরে যত পণ্ডিত মুর্খ
যত আবাগীর ছাওয়াল,
হাজার বিদ্যাতেও
পারবি না বলতে,
আজ যে আছে সিংহাসনে
কি হবে তার কাল?

পেরেছিলি বলতে কি
এমন দিন আসবে দুনিয়ায়,
ঘরবন্দী হবি ভয়ে সিঁটিয়ে
মুখ ঢাকবি কাপড়ের তকমায়?

শিক্ষক

তোমার জন্যই
ছোট থেকে
বড় হওয়া।
তোমার জন্যই আলো
তোমার জন্যই
বুঝতে শেখা
কোথায় মন্দ-ভাল
তোমার জন্যই
বই-এর সাথে
মিষ্টি সখ্যতা,
তোমার জন্যই
তুচ্ছ হয়েছে
সকল ক্ষুদ্রতা।

তুমিই শেখালে
বইয়ের পাতায়
যা আছে লেখা
তা জীবনের কথকতা
জীবন দিয়েই মিলিয়ে নিও
বই-এর লেখার সত্যতা।
আকাশই যদি যাই মিলিয়ে
তবে আকশেই থাকুক চোখ,
আকাশের মাঝেই
উদারতার মহান শিক্ষক।
মাটির গন্ধ তুমিই চেনালে
প্রেমের গভীরতায়
আকাশ-মাটির মিল ঘটালে
তোমার শিক্ষার চেতনায়।

তোমার জন্য

তোমার জন্য আকাশ বাতাস
আলোর কুচির গান
তোমার সাথে মেশান নেশায়
বিকল্প উড়ান।
তোমার কলম টানে আমার
স্বপ্ন মাঝরাতে
হঠাৎ জেগে আল্পনা দেয়
হৃদয়ের গোপন সুড়ঙ্গতে
তোমার জন্য ছন্দ লেখে
নিজের ভাবনায়
পরিযায়ী প্রেম তোমার জন্য
কোথাও থমকে দাঁড়ায়

তোমার চাওয়ার অভিসার জুড়ে
দ্বিধার তরঙ্গ
তবুও কবি তোমার প্রেমে
সক্রিয় সুড়ঙ্গ।

পথের বাঁকে

ডঃ সুভাষ রায় চৌধুরী
অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

একলা চলার পথে
বন্ধু , তোমার সাথে
দেখা হয়েছিল
কুসুমগ্রামের পথের বাঁকে।
বলেছিলে,
সুন্দর হে
তোমায় - আমায় দেখা হল
পঁচিশ বছর পরে
পথের বাঁকে এসে
মনে হল না দেখাই ছিলো ভালো।
ছিলেম আমি অনেক দূরে
অনেক গুলো মাঠ পেরিয়ে
আকাশটা যেখানে মেশে
দূরের ঐ দেশে।
ভালো নেই।
ছিলাম না গো ভালো,
তোমার সনে দেখা হবে
ভাবিনি কখনও -
মনে হল
মনের দুয়ারে
ছড়িয়ে দিলে আলো।
মনে পড়ে-
এক বৃষ্টি ভেজা রাতে
প্রথম দেখা তোমার সাথে
বাগানে কৃষ্ণচূড়ার পাশে,
পরনে নীলাম্বরী
কাজলকালো আঁখিদুটি
ভিজে ঠোঁট
ভেজা লম্বা কেশরাশি
তুমি সদ্যস্নাতা;

দেহ পল্লবে কুসুমে কুসুমে
না বলা কত যে কথা
লিখেছিলে কৃষ্ণচূড়ার পাতায়
ভিজে যাওয়া কৃষ্ণচূড়ার
ফোঁটা ফোঁটা জলে।
অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে
সদ্য ভেজা এলোচুলগুলি সামনে এনে
লজ্জাবতী লতার মতো
আমার সামনে এলে;
বাহু দুটি দিয়ে
তোমায় বাঁধতে চেয়ে
তোমার আঁখির তারায় চেয়েছিলাম।
তুমি চিতল হরিণের ক্ষিপ্রতায়
একটু দূরে দাঁড়িয়ে
বলেছিলে অস্ফুট স্বরে -
আমি যে তোমারি,
স্পর্শে তুমি কতটুকু পাবে
পারো না জীবনের তরে
হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধতে।
মনে পড়ে
সবুজ ঘেরা মাঠে
আলের পথ চেয়ে
মাঠের শেষে নদীর পাড়ে
পৌঁছে গিয়ে দেখি -
গোধূলির রঙে রেঙেছে নদীর জল,
মাছরাঙা পাখিটা
অনেক দূরের আকাশ হতে
উড়ে এসে
টুক করে মাছ নিয়ে
উড়ে গেল আপন মনে নিজের ঘরে।
গোধূলির অন্তরাগে
সোনালী আলোর রেখায়
তোমার মুখখানি
রাঙা হয়ে উঠেছিল,
আমরাও বোধহয় খুঁজেছিলাম
ছোট্ট আপন ঘর,
সেই ছোট মাছরাঙা পাখিটার মত
স্বপ্ন দেখেছিলাম কত শত।
পঁচিশ বছর পরে
হঠাৎ তোমায় সামনে পেয়ে
আমি যে আত্মহারা,
স্মৃতিমেদুর মনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে
স্মৃতির পাতায় হারিয়ে -
তোমায় দেখি, দেখি তোমার আঁখিদুটি-
ক্লান্তিহীন অপলক দৃষ্টিতে
চেয়ে আছো আমার পানে।
একেবারে পঁচিশ বছর আগের মত
তুমি নেই -
চোখের পাতা হয়েছে ভারী কাজল কালো নয়নে
দৃষ্টি আছে একই রকম,
টোল পড়া গালে
গোধূলির সোনালী আলোয়
আরও সে মোহময়ী,
চুলের ঢেউয়ে -
মেঘরাশি রয়েছে সারি সারি।
অধরা ঠোঁট, ওষ্ঠে না বলা কথার ভাষা
আজও আমি বুঝি
ঠিক আগের মত।
কি চাও তুমি ?
চাই তোমাকে
তোমার মননে, চিন্তনে, দেহপল্লবে।
ঠিক আগের মত করে ?

ঠিক আগের মত করে ।
আমি যে অপূর্ণ!
আমিও তো।
তাই পূর্ণতার খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে
এই কুসুমগ্রামের পথের বাঁকে
দেখা হলো তোমার সাথে।
অপূর্ণ থেকে পূর্ণে
ঘূর্ণির আবর্তে
জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে
চলবে কি আমার সাথে?
না।
তোমার মনে হঠাৎ দেখায়
বুঝলাম আমি অপূর্ণ,
পথের বাঁকের বাঁদিকটা আমার
তোমার ডান দিকটা।
বললে তুমি, বন্ধু, দেখা হবে কবে?
অন্য কোনোখানে
জীবন সায়াহ্নে
আবার কোনো পথের বাঁকে;
আমার এই চলার পথটা
হয়তো মিশে যাবে
আবার অন্য কোনো গ্রামে
অন্য কোনো পথের বাঁকে।
অপূর্ণ থেকে পূর্ণতার খোঁজে।

রোজনামচা

প্রিয়তোষ দত্ত
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

১. জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে গুন্ডাদের আক্রমণ দেখে স্তব্ধ, লজ্জিত।

গুন্ডারা গুন্ডামি করবে - এতে লজ্জা কোথায়। যারা করাচ্ছে, তাদেরকে আমরা এখনো গুন্ড্র বলতে পারছি না, তারা আমাদেরই প্রতিনিধি, আমাদেরই নির্বাচন - লজ্জার এটাই।

শুধু লজ্জা নয়, ভয়েরও। JNU যেন ভারতের ছোটো সংস্করণ, আজ যা JNU তে, কাল তাই ভারতে। তবে ভরসা এই যে আক্রমণ তখনি আসে যখন মানুষ সত্যের পথে থাকে, বিপক্ষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। ঘোর অন্ধকার জানান দেয় - ভোর খুব দুরে নয়।

লজ্জা বা ভয়ই শুধু নয় - একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা বা কষ্ট হচ্ছে....। আমি মার খেতে পারি, মেনে নিতে পারি, কিন্তু আমার মেয়ের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে চোখের সামনে - এটা সহ্য করা কষ্টের, খুব কষ্টের। এ যন্ত্রণা আমার পিতৃ অস্তিত্বের বোধহয়।

২. একটি মেয়ে ধর্ষিত হওয়ার খবরে আমার যে কষ্ট হয়, চোখে যন্ত্রণার বাষ্প জমে দৃষ্টিকে দেয় ঝাপসা করে, দেখতে পাইনা তার নাম শেলী না শবনম নাকি শালিনী, শুনতে পাইনা তার ধর্ম নিয়ে পণ্ডিতদের সখের মজলিশী বিতর্ক। আমার ক্লাসের ছাত্রীর মুখ ভেসে ওঠে, আমার মেয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বাবা হিসাবে শিহরিত হই। বিশ্বাস করুন তখন ভুলে যাই আমি বাম না ডান, বুদ্ধিজীবী নাকি....

ক্যা ক্যা ছি ছি ও আরও সব কিছুই গুলিয়ে যায়, বুদ্ধি কাজ করে না, সব কিছুই তখন ছিঃ মনে হয়। বিশ্বাস করুন, একেবারে মনের কথা, বুদ্ধিজীবীর বাতুলতা নয়।

এ দল ও দল খেলতে গিয়ে আমাকেই হারিয়ে ফেলতে চাই না, আমি কোনো দলের জন্য নাকি দল আমার জন্য, গুলিয়ে যায় মাঝে মাঝে। আমি অমুক, আমি তমুক এর অমুকপন্থী, তমুকজীবী, করতে করতে জীবনের বেশিটা সময় তো চলে গেল। যেটুকু বাকি, তাতে আমার মধ্যে মানুষটার খোঁজে বেরুতে হবে, বড্ডো দেরি করে ফেলেছি। সেই মানুষটা যে মানুষটা শুধু মানুষের কষ্টে কাঁদতে পারে, কষ্টের কোনো জাত হয় না। কষ্টের কোনো রং হয় না। তাই হয়তো আমি জাতি হীন, ধর্ম হীন বেরং এক মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই - আর যে কটা দিন আছি। সুখী হওয়া - আমার জন্মগত অধিকার, কারোর ক্ষমতা নেই তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করার। ধর্ষিতার কষ্টে কষ্ট পেতে যেদিন ভুলে যাব - ডান - বাম - হিন্দু - মুসলমান চুলোচুলির চাপে, সেদিন থেকে অসুখী আমার জন্ম। চারদিকে এতো অসুখ, এত অসুখী, সুখের দিশাটাকেই দেয় আরো গুলিয়ে। আমাদের মূল লড়াইটা বোধহয়, এই সঠিক দিশাটাকে খুঁজে পাওয়া, তাকে জাপটে ধরে, জড়াজড়ি করে থাকা, তার সাথে সাথে, পায়ে পায়ে এগোনো, কোনো গন্তব্য নয়, শুধু সুখের সহযাত্রী হয়ে মানুষের সাথী হয়ে, খুব ভেতর থেকে সুখী ও খুশী হয়ে একদিন প্রকৃতির মাঝে লীন হয়ে যাওয়া....

৩. স। কি পরিহাস।

তিনটে শব্দই শুরু স দিয়ে।

জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে যা যা সবাইকে এক করে দেয়, তাদের অন্যতম সুর, সংগীত, সরগম যার শুরুতেই সা।

যা যা বিভেদ করে তা হলো সাম্প্রদায়িকতা।

আর ওদের মাঝে বেচারা সংবিধান, স্ব-মহিমায় (!) বিরাজমান।

বড়ে গুলাম আলী, সুরের সাধক, গানের শেষ কলিতে 'হে রাম' বাদ দিতে কেন হবে বুঝতে পারেন নি। পাকিস্তানের বেতার কর্তৃপক্ষ জোরাজুরি করলে আলী সাহেব চিঠি লিখলেন রাজেন্দ্র প্রসাদকে। আমি সা এর পূজারী, তুমি স (সংবিধান) এর। ভারতে আমার জায়গা হবে? উনি এলেন কলকাতায়, ভারতে, বাকিটা ইতিহাস। ভাবনা হয়, আজকের বা আগামী দিনের গুলাম আলীদের আমরা কি আর জায়গা দিতে পারবো? নাকি উল্টে পণ্ডিত যশরাজকে বলবো তোমার ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম থেকে আল্লাকে বাদ দিতে হবে। তা না হলে যাও পাকিস্তান!

৪. Symmetry Music ও Sexuality

ছোটোবেলায় রেডিওর কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে সেই স্টেশনগুলো চকিতে পেরিয়ে যেতাম যেখানে গান বলে কিছু একটা হচ্ছে, কিন্তু হতো শুধু আ আ উ আ, যেন যন্ত্রণায় কাতর কাউকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ নাকি আপন খেয়ালে খেয়াল গাইছে। অবাক হতাম, এটা গান? এখন অবাক হই, এর বাইরেও গান হয়? এই অবাক করা দুই দ্বীপের মাঝে সেতুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন লম্বা দাড়ির লম্বা চির যুবক বুড়োটা।

এবার আবার অন্য রহস্য। একেকটা রাগ ঠাট এ বাটে, চলনে, গমকে কত আলাদা, চাপান - উতোরে, ভাবে ভঙ্গিমায় রূপে ভিন্ন। স্বর চয়ন ও বিন্যাস তাদের আলাদা, যদিও স্বর কম, তাতে সুরই বেশি। উল্টো দিকে তাল? ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে থুন না না কৎতা ইত্যাদি। বোল- সর্বস্বতা, না সুর, না স্বর। অথচ একই তাল কেমন ঘিরে থাকে কতো ভিন্নতার রাগমালা। প্রায় সব রাগের আলাপি প্রকাশে সাথী হয় তিনতাল নয় একতাল। কি অদ্ভুত না। বৈচিত্র্যের সাথে একের যে এই বাঁধন, সুরের সাথে তালের যে এই প্রেম, মেলবন্ধন, তাকি ঈশ্বর - প্রেম ছাড়িয়ে আরও ঐশ্বরিক?

একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর যেন ৪৮ টি খুটি দিয়ে সীমায়িত, ৪ এর গুণিতকে তারা সাজানো, নির্দিষ্ট কঠিন কঠোর সীমানা - ধিন ধিন ধা গে... constancy of a rigid Symmetry। কিন্তু খুটিগুলো জড়িয়ে যে সুতো বা তারের ঘের - তারা সব ঢিলেঢালা, flexible, যতোখুশি ভেঙেচুরে নেওয়া যায়। Symmetry-র লালচোখ ভয় দেখায় না। বাইরের মোটের Symmetry বজায় রেখে অন্তর্লীন Symmetry-র এই ভাঙা গড়ার যৌথ সৌন্দর্যে বিচ্ছুরিত হতে হতে একটি রাগ বালিকা যখন কিশোরী, কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে ওঠে - একতালের পুরুষালি ছোঁয়ায়। এও তো এক যৌনতা, সুড়সুড়ি হীন, ঐশ্বরিক যৌনতা। Symmetry পয়েন্ট গ্রুপ, গ্রুপ থিওরি ও এদের সংশ্লিষ্ট অঙ্কগুলি - সেই অর্থে কম আদি রসাত্মক নয়। অ্যাবস্ট্রাক্ট - সৌন্দর্য - যৌনতা, এক জায়গায় কেমন যেন একাকার হয়ে যায় - যেমনটি হয় রক্তকরবীর রাজার, নন্দিনীর চুলের ছোঁয়ায় - রক্ত মাংসের শরীর নয়, শুধুই এক গোছা চুলের পরশ।

রাবীন্দ্রিক যৌনতা, কি মিষ্টি, কি সরল অথচ গভীর। আমরাও তো হাজারো লাখো রাগ রাগিনী, হাজারো রকমফের। কতো ভিন্ন সুরে বাজি। আমাদেরও

একটা ঐকতানের তাল আছে, একতাল বা তিনতালের মতো।
আমাদের সংবিধান।
তার overall সিমেট্রি আমাদের ঘিরে থাকুক, তারই মাঝে ব্রোকেন Symmetry র রসসিক্ত আমরা মুক্ত স্বাধীন। সম এ ফিরে পরস্পরের মুখোমুখি হাসিমুখে গাইতে পারি তো - জীবনের জয়গান।

৫. ভাষা, কেমিস্ট্রি, আমার মেয়ে আর আমি

তৃণ, আমার মেয়ে, প্রথম শ্রেণীর সম্মানের সাথে রসায়ন - স্নাত হলো, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। আমি রসায়নের শিক্ষক, একটু উত্তেজিত, উচ্চ শিক্ষার স্থান, মান ইত্যাদি ভাবনায়। তা আমার উত্তেজনায় জল ঢেলে এক ঠাণ্ডা সকালে ততোধিক ঠাণ্ডা মাথায় মেয়ে জানান দিলো - 'রসায়ন বিজ্ঞান টা টা, আমি ভাষাবিজ্ঞান পড়বো।'
মানে?
- মানে লিঙ্গুইস্টিক।
ভাষাবিজ্ঞানে আমার জ্ঞান নেহাতই ভাসা ভাসা। ভাষা তো ভাষাই, তার আবার বিজ্ঞান, সেটার উপর পড়া?
- বাবা, কেমিস্ট্রি পড়তে গেলেও একটা ভাষা লাগে। Of course লাগে, কিন্তু পড়ি তো কেমিস্ট্রিই, ফোকাসটা কি ভাষা নাকি কেমিস্ট্রি? দৈনন্দিন জীবনে কোথায় রসায়ন আর কোথায় ভাষাবিজ্ঞান। জীবিকায়? প্রচণ্ড হতাশায়, বিরক্তিতে, রাগে নেমে তো পড়লাম ওকে বোঝানোর দুরূহ কর্মে - একজন দায়িত্ববান সমঝদার উচ্চশিক্ষিত উদারপন্থী বাবা হিসাবে।
- ক্রমে বোঝানোটা পাল্টে গেল তর্কে, প্রায় ঝগড়ায়। কথাবার্তার সুর গেল পাল্টে, শব্দরা বাগ মানছে না - আমার সংস্কৃতি মনস্ক যুক্তিবাদী মনের। ছিটকে ছিটকে বেরোতে লাগলো সেই সব শব্দরা বা কথারা ঠিক যা হয়তো আমি বলতে চাইছি না। অথবা যা যা বলছি, তাদের মানেরা স্থির নয়, সংগতি থাকছে না। মাঝে মাঝে যাকে বলে ভাষাহীন হয়ে পড়ছি কিংবা ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অনর্থক অর্থহীনতায় ভুগছে আমার ভাষা।
এরকমটা হয় প্রায়ই, সবারই বোধহয়। কি মুশকিল, একি আমার ভাষার দীনতা, নাকি আমার চিন্তা-ভাবনা, যুক্তির, নাকি দুটোরই? পারস্পরিক ভাষার চাপান - উতোর আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করছে নাকি চিন্তা ভাবনাগুলো ঠিক করে দিচ্ছে আমাদের ভাষা? এখন দেখছি 'ভাষা তো ভাষাই' এতো সহজ নয় বিষয়টা। এই প্রথম ভাষা ভাষা জ্ঞানের অসম্পূর্ণতায় অসহায় বোধ করছি। ভাষার বিজ্ঞানটা জানি না, দর্শনটাও। ভাষার অভাবিত সুফল কুফল নিয়ে ভাবিনি আলাদা করে!
আজ ভাবছি। ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। আমার সমাজ, আমার দেশ ভাবতে বাধ্য করছে। আমার যে প্রতিনিধি সে আমার জন্য ভাববে, কাজ করবে। কিন্তু সে কি আমার ভাষায় কথা বলবে? কিংবা তার ভাষা কি আমারও ভাষা? ভাষা তো মনের, চিন্তার, ভাবনার বাহক। 'দেশকো গদ্দারকো গোলি মারো....' এ যদি আমার ভাষা হয় তবে তার পেছনের ভাবনাটা কি? গান্ধীর ঘাতককে যে ভাষা দেশপ্রেমীতে রূপান্তর করে, তা শুধুই ভাষাই থাকে না, 'ভাষা তো ভাষাই...' কে ছাড়িয়ে তা তখন একটা ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়, হয়ে ওঠে একটা দর্শন, নীতি ছাড়িয়ে তা ন্যায়ে পৌঁছায়।
ভাষা আর ভাবনার রসায়নটা বড়ো জটিল। গডসের দেশপ্রেমের ভাবনাটা হয়তো কয়েকজনের উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু সেই ক'জনের ভাষা যখন

কৌশলে ভাবনাহীন জনগণের ভাষা হয়ে যায়, তখন সেই গড্ডালিকা প্রবাহ হয় ধ্বংসাত্মক, আমাদের অজান্তেই ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। তখন কিছু করার থাকে না, আমাদের নীরবতা কড়ায় গণ্ডায় দাম দেয়। তাই আমাদের জন - গণ - মন - অধিনায়ক দের ভাষা আমাকে ভাবাচ্ছে। ভাবতে হবেই। গডসের দেশপ্রেম বা গোলি মারো গদ্দারকো-এ ভাষা আড্ডার ভালো খোরাক হতে পারে, গান্ধীজির দেশপ্রেমের প্রশ্নে ওরা-আমরায় ভাগ হয়ে কাপে তুফান তুলতে পারি। এ অবধি ঠিক আছে। কিন্তু অবহেলা বিলাসিতা যে আবহ তৈরি করে,আর সেই প্রেক্ষিতটা তৈরি হয় যখন আপনারই কোনো ১৭ বছরের আপনজন পিস্তল হাতে বেরিয়ে পড়ে, গুলি চালায়, একটি টাটকা জীবন হয় ভিড়ে হারিয়ে যায়, বা একেবারেই হারিয়ে যায়, তখনো কি বলবো 'ভাষা তো ভাষাই।' অবশেষে মেয়েকে বলতে পারলাম, হাসিমুখেই, ভাষার রসায়নটা রসায়নের ভাষার থেকে কম কিছু জরুরী নয়।

চরৈবেতি। গো এহেড। আমরা তো পাশে আছি, মা আমার।

৬. ৭,৫০,০০০ = কত?

সাতশ পঞ্চাশ হাজার, নাকি

সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার?

আমার লিঙ্গুইস্টিক - ছাত্রী - মেয়ে বলল, দুটোই। এটায় অঙ্ক যতটা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে ভাষার অঙ্ক।

যাঃ বাবা, এরকম বুঝি?

কত কি যে শেখা বাকি?

অগত্যা আমার পড়তে হবে বইয়ের তালিকাটি একটু দীর্ঘায়ত হলো : Mathematics of Language (algebra, calculus, matrix, determinants, set theory, probability, statistics কি নেই তাতে)

৭. Einstein, Me and my Religion

I am not an atheist, I don't know if I can define myself as a pantheist. The problem involved is too vast for our limited minds.'

আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? এই প্রশ্নের ওটাই ছিল বসের কিঞ্চিৎ confusion এ ঘেরা উত্তর, এলবার্ট আইনস্টাইনের।

আরেক প্রশ্নে বিগবস বলেছেন 'Religious Truth' conveys # nothing - clear to me at all.

আগেই বলেছি : Truth দুধরনের, Absolute আর statistical, So, the question of religious truth is a false question. It does not exist, so conveying any meaning does not arise at all,

তাহলে কি দাঁড়াল বল? আমি কি রিলিজিয়াস? এই কালপ্রিটটি সেই সেদিন থেকে কম ঝামেলা করেনি। কিন্তু অন্যরাও কম কিসে? যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। আপনি বলবেন এ অতি পুরানো, ক্লিশে টপিক, মানুষ এর জন্য দায়ী, বিজ্ঞান নয়। মশাই, রিলিজিয়ন ও তো মানুষেরই তৈরি, তার বেলা? আসলে মানুষকে বাদ দিয়ে যে বিপ্লবই হোক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য - তা সে সবুজ বিপ্লব, অক্টোবর, নভেম্বর যে বিপ্লবই হোক।

চুপিচুপি বলি, হ্যাঁ আমি রিলিজিয়াস if it's redefined. কিরকম?

আচ্ছা, এই গ্লোবালাইজেশন এর রমরমা বাজারে এতকিছুর গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে, একটা গ্লোবাল রিলিজিওন এর পেটেন্ট নিলে কেমন হয়। এমনটা তো হয়ই অণু-পরমাণুর জগতে।

Atomic অরবিটালরা symmetry র মলম মেখে

কেমন জড়াজড়ি করে (symmetry adapted linear combination, SALC) মলিকুলার অরবিটালস তৈরি করে নেয়, এ তো বন্ধনের (bonding) বা বন্ধুতার গ্লোবালাইজেশন। MOT র (মলিকুলার অরবিটাল থিওরি) মত একটা ROT (Religious Orbital Theory) না হওয়ার কি আছে?

কত ছোট আমরা, মানুষেরা। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনেরা যা পারে, আমরা সেটুকুও পারি না? অথচ অণু-পরমাণু দিয়েই তৈরি আমরা। পারি, পারি। পারি যে... এই বিশ্বাস ও ভরসা কে দেবে আমায়? ধর্মই তো। অন্তত দেওয়ার কথা। মানে, আমি সেভাবেই রিডিফাইন করতে চাই ধর্মকে। A way of life, a journey, not a destination (যা কিনা আইনস্টাইনের রিলিজিয়াস ট্রুথ) খোঁজে আছি, পেলে পরম ধার্মিক হতে আমার আপত্তি নেই। তখন আইনস্টাইনও হয়তো # confusion - কাটিয়ে বলতেন 'Yes I am Pantheist' আপনারা?

৮. বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা,

নাকি একতার মধ্যে বৈচিত্র্য

নাকি

মাঝামাঝি কিছু?

৯. 10 times 370 = 3700

[It's not just a mere mathematical calculation, it reflects the pain, the agony of an ordinary woman, pain of not being able to raise her voice as and when needed. She has just put a token protest against the ongoing murder of her beloved democracy.]

The story goes like this:

Her husband got a surprise call from her, she was asking where he has kept the money, in which drawer? She needs exactly 3700/-

Why, he asked.

She answered mysteriously: simply because 3700 is 10 times 370.

He got perplexed but was happy to know that she has chosen something for her own and is buying on her own at her doorstep. For the first time in their 24 years of marriage, something is being bought for her by either of them. He simply failed to give her even a saree, even on her birthday or anniversary.

He failed not on a financial ground or anything else but she just didn't want those. She needs so little!

But the mystery remains unanswered to him. What happened to her?

What she is buying suddenly and that too at Rs. 3700?

He just reminded her that those doorstep hawkers simply cheat and not to forget to bargain the price.

Ohh, sure, I will do that. The hawker has asked for Rs. 3500/-, she told.

Then why are you asking for 3700? To his utter surprise and suspense, she hang up the phone.

Coming back, their daughter showed him the kashmiri shawl from a Kashmiri.

(Somehow I know that woman. And I am happy by spending something for her, even its 200 more. My daughter will remember the call Chhoti from an unknown Kashmiri brother).

১০. 18 February 1836

আজ রামকৃষ্ণের জন্ম দিন।

এক বা দু লাইনে রামকৃষ্ণকে যদি বুঝতে চাই, সেটা কি হতে পারে?

খুব ভালো ভালো one - liners পাচ্ছি। তেলের দাম বাড়লে মাছের তেলে মাছ ভাজার চল আছে।

কষ্টার্জিত কেনা তেলে ভাজলে কি ভাবে ভাজবো?

মানে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বললে কি বলতে পারি?

আমার বোধ RK is the man who is 100% TRUE to himself । অন্যভাবে বললে ভাবের ঘরে চুরির পরিমাণটা যার 0.0%।

ভাবের ঘরে চুরির এর থেকে ভালো ইংরেজি অনুবাদ থাকলে জানাবেন, প্লিজ। অথবা RK র থেকেও কোনো উৎকৃষ্টতর anti-example জানা থাকলে...

১১. নিরামিষ বিজ্ঞাপন ও একটি নিরীহ ভাবনা

'একুশে সেলিব্রেট করুন শুধুই কোকা কোলার সাথে।

কো ক ভালোবাসে বাংলা, তাই
বাংলা ভালোবাসে কো. ক।'

সেলিব্রেট?

ভাষার থেকেও বেশি জরুরি, বেশি আদরের, দিনে কয়েক হাজার বার যার সাথে অহরহ ওঠ-বস, তা তো আমরা সেলিব্রেট করি না - এ প্রশ্ন মাথার সাত মাইলের ভেতর এলে আপনি কিন্তু রীতিমতো ভাষাদ্রোহী। কিন্তু সে বস্তুটি কে/কি? কেন, অনেক কিছুই হতে পারে, এই যেমন ধরুন আমাদের 'শ্বাস-প্রশ্বাস'। আমাদের জীবন!

[ভেবে দেখতে পারেন যাতে জীবনের ছোঁওয়া নেই, কিংবা জীবনে যার ছোঁওয়া নেই, এরকম কোন কিছুই সেলিব্রেট করবেন কি না, করলে কি ভাবে?]

সেলিব্রেট করুন, 'শুধুই' কো. ক এর সাথে।

কেন, অন্যেরা কি দোষ করল?

এ প্রশ্ন করলে সন্দেহ হয় আপনি দলবাজি করছেন। একটাই ব্র্যান্ড বা দল থাকলে দলবাজির কোন সুযোগই নেই, ভালো না কি?

'কো. ক ভালোবাসে বাংলা, তাই
বাংলা ভালোবাসে কো. ক।'

এই 'তাই' এর উপরেও যদি অহেতুক জোর দেন, তবে তো আপনি মশাই নেহাতই ছিদ্রান্বেষী। এ-তো আদি, অকৃত্রিম, 'বিনিময়' প্রথা Give and Take, তুমি ভালোবাসো তাই ভালোবাসি, সিম্পল।

জানি, এরপরও প্রশ্ন তুলবেন, কো. ক বাংলাকে ভালোবাসে - কি করে বুঝলেন?

কেন, বোতলের গায়ে Coca Cola র বদলে বাংলা কোকা কোলা মুক্তাক্ষর গুলি কি আপনাদের চোখ এড়িয়ে গেছে? এর থেকেও বড়ো প্রমাণ আর কি চায়?

চিন্তা নেই।

ভাষার প্রতি, ভালোবাসার প্রতি আপনার দায়, দায়িত্ব, অভ্যেস, চিন্তা কাজ - এ সব নিয়ে যাবতীয় প্রশ্ন ভাষা - কোক ভালোবাসার ককটেল ই গুলে দেওয়া আছে।

আপনি শুধু - ঢক ঢক ঢক।

১২. প্রবাদে বিবাদ

পক্ষ তোমায় নিতেই হবে, নিরপেক্ষ থাকার জো নেই -

'আপনি বাঁচলে বাপের নাম',
নাকি
'আমরা আছি, তাই আমি আছি'

I am because we are... (Ubuntu)

১৩. ওলো সই মনের কথা কই

আজ বই পঞ্চমী। আজ বিশেষ কোন বই নয়, বরঞ্চ বই বাগানো, বই হাতানো, চুরি, দরাদরি বই'র সই, সই'র বই - এসব কথাই হোক।

বই নিয়ে দরাদরি

খুবই পুরনো লজঝড়ে এক বই তুলে বললাম - কত? ফুটপাথের অক্সফোর্ড - মালিক ছেলেটি বলল - পনেরো।

সে কি, অসম্ভব। ঠিক করে বলো।

- এক পয়সাও কম হবে না। আরো গম্ভীর সে।

আমিঃ- শোনো, বইটা আমি নেবোই, আর পনেরো টাকাও দেবো না।

- পোষালে নেন, না হলে ফুটুন, পনেরো টাকাই।

আরো কিছু কথা, পাল্টা কথায় সে উত্তেজিত, আমিও নাছোড়। দু চার জনের ভিড় বাড়লো। একটা রফায় আনার চেষ্টা। প্রায় সবাই যখন আমার মতলব খোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত, বললাম - দাদারা, আমি পনেরো নয়, কুড়ি টাকা দিতে চাইছি, কিন্তু ও শুনলে তো ....

একরাশ হাস্যরোলের মাঝে দু-জনেরই শুধু মুচকি হাসি -প্রেমেন মিত্তির আর ঘনাদা। ওদেরই বই কিনা ওটা।

বই বাগানো অথবা সরল আব্দার

আমার মেয়ের খুব হিংসা আমার বই আর ভাগ্যের উপর। কত লোক যে আমাকে বই প্রেজেন্ট করেছে।

Presented to Priya (da)

by xxx

মেয়ে তো আর জানে না ওই এর ঘাড়ের উপর শব্দ কটার লেখক নন স্বয়ং আমি। তবে সৌভাগ্যই তো-বই বাগানোর আব্দার কি এমনি এমনি!

আজ কাল পরশু বা তারও পরে

কিছু বই আজকেই টাটকা পড়ে ফেলতে হবে। কিছু আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু। কিছু, 'কোন এক দিন'। আর কিছু থাকে হয়ত কোনোদিনই পড়া হবে না, কিন্তু সঙ্গে আছে এই আনন্দেই দিন কেটে যায়।

বই উপহার দেওয়া ও পাওয়া বহু দিনের অভ্যেস। অনুষ্ঠানে বইটি দেখিয়ে ফেরত নিয়ে এলাম পরশু দেবো বলে - এরকম হয়েছে অনেক বার। এরা সব ওই 'আজ-কাল-পরশু'র দলের বই। শীষেন্দু, সমরেশ, সুনীল... এ ভাবেই পড়া।

দোকানে খণ্ড ১ হাতে নিয়ে বলেছি - যাকে দেবো তার এটা থাকতেও পারে কালকেই যদি পাল্টে খণ্ড ২ নিই খুব অসুবিধে হবে? প্লিজ...

খণ্ড ১ রাতারাতি শেষ করে, খণ্ড ২ বদলে নিয়ে - সেটাও পড়ে - ওই 'তরশু' দিয়ে এসেছি যাকে দেওয়ার। P.K. Basu, Bar at Law তাতে কিছু মনে করেননি। কাঁটা সিরিজ এভাবেই।

বই চুরি

হ্যাঁ তাও করেছি (CC টিভি ছিল না তো) Proof without words, Vol 1 এক বহু-ডলারী বই সাধ্যের বাইরে গিয়ে কিনে Vol 2 স্রেফ চুরি। ওই একটি বারই, পাক্কা চোর। মনস্তাপে অনেক বই কিনেছি পরে ওই দোকানে। ওদের প্রকাশনায় এই চোরের একটি বইও বেরোবে শীঘ্র। পাপস্খালন আর কি!

বই যখন পারিশ্রমিক

বক্তব্য রাখতে গিয়ে হ্যাংলার মতো শর্ত দিয়েছি - ধাতু বিগলিত নাম- বিরাজিত দামী অথচ নেহাতই অদরকারি সম্মান ফলক নয়, পরিবর্তে আমি বই নেবো, আমার পছন্দে। স্টিফেন হকিং এর The

Dreams that Stuff is Made of চেয়েছি ও পেয়েছি। গত সপ্তাহে পেলাম কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড। দেখি প্রথমটা যদি কেউ দেয় আমার হ্যাংলামি ভালোবেসে।

To লোপামুদ্রা

প্রথম দু পাতায় নাম, লেখক, বড়জোর প্রকাশক, উৎসর্গ কাকে, কে আর দেখে! R L Duttaর Inorganic Chemistryর To Lopamudraর লোপা যেদিন থেকে M.Sc. র ক্লাস মেট, সেদিন থেকে উৎসর্গ পাতাটাও দেখতাম। কে কবে কোন মেট হয় বলা যায়?

কলেজ স্ট্রিট ফুটপাথে ধূলি ধূসরিত এক বই যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। Peace Culture Education - বাঙালি লেখক, উৎসর্গ এক জাপানি কে।

অনেক পরে যিনি হয়ে উঠলেন আমার আরেক মেট। এক বুদ্ধিস্ট স্কলার ও Daisaku Ikeda প্রেসিডেন্ট - Daisaku Ikeda - যাঁকে honorary Doctorate দিয়ে সম্মানিত ভারতেরই ১৮ টি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী সমেত, মোট সংখ্যা ৩৯৮, এখনো পর্যন্ত।

শ্বশুর ভাঙিয়ে

বাবা-ইন-ল বেশ অসুস্থ, দেখছেন বিশেষজ্ঞ এক ডাক্তার, আমার স্ত্রীর দাদার বন্ধু। কিছুতেই নেবেন না ফিজ, সাত দিনের। আমার উস্কানিতে বাবা-মশাই ও কিছু দেবেনই। অগত্যা বই। একটু দামী যেন হয় পছন্দ (আমার আবার কার!) 'গোডেল এসার বাখ' । দাতা তো রাজী, কিন্তু রাজী হলেন না ডাক্তার বাবু। অগত্যা বইটি আমার তাকে, হিসেব মতোই।

মৌ মরিসন এবং এখনো

আমার বই বিক্রি সেটাই প্রথম, তাও আবার আমার প্রথম প্রেমকে (এবং শেষও)। যদিও তখনো তা একমুখী র কেনা বই, র সহপাঠিনীকে - মরিসন - বয়েড এর অর্গানিক কেমিস্ট্রি।

বত্রিশ টাকায় কেনা, কত দাম নিবি?

আর দাম। যাকে সবই দিতে বসেছি, তার কাছ থেকে নেবো আর কি? আমি তো জানি বই তো ফেরত আসবে বইয়ের নতুন মালকিন সমেত, আমার কাছেই। মাইরি বলছি, ওরা দুজনেই এখনো আমার সাথেই।

আটকে যাই তিন পাতাতেই

তখন ফ্লিপকার্ট, আমাজন জমেনি, পুরনো, এ হাত ও হাত ফেরত বই বেশ কম দামে দিচ্ছে infibeam.com বহু ডলারী / পাউন্ডি বই কয়েকটা সস্তা গান্ধিছাপেই দিব্য পাচ্ছি। চোখে পড়ল একটা বই, লেখক দু-দুটো নোবেল মালিক। কেমিস্ট্রি আবার শান্তিও। কিনে তো ফেললাম, কিন্তু পড়তে পারছি কই! তিন নাম্বার পাতাতেই আটকে যাচ্ছি। সেখানে-না, ছাপানো নয়, কলমের আঁচড়ে লেখকের নিজের হাতে লেখা ওনার নাম লিনাস পাউলিং।

১৪. আজ বই ষষ্ঠীতে অল্প স্বল্প কথা। শহরে রাখাল, তবুও আমার দেখার দৃষ্টিতে ইশারা অবিরত - বটপাকুড়ের ফেনা আর ইছামতির মশাদের। আমার সময়ের জলছবিতে কল্পনার হিস্টিরিয়া। কখনো তাতে দামিনীর গল্প কখনো বা উর্বশীর হাসি আঁকে কাম্পোর রবি - আমার কালের যাত্রা, রবীন্দ্রনাথ। সামান্য অসামান্য এ আমির আবরণ জুড়ে শুধু নির্মাণ আর সৃষ্টি, আরোপ আর উদ্ভাবন। কাঁধে আমার ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আমি যা, - তা হওয়ার দুঃখ কিছু নেই, নিরহং শিল্পীর ক্ষুদ্র দাবী শুধু ভিন্ন রুচির অধিকার।

আমার আছে তো এক ঘর, বই এর ঘর, এক বারান্দা, তাইতেই কবিতা লেখা, কবিতা পড়ার ছন্দোময় জীবন।

কবির অভিপ্রায় তো ঐতিহ্যের বিস্তার, আর কবির ধর্ম তো শব্দ আর সত্য। তবুও চোখের সামনে, 'এখন সব অলীক' বলে, নিঃশব্দের তর্জনী নেচে উঠলে -

জার্নাল থেকে, ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে আমার সব কবিতার মুহূর্তরা।

আমাকে বাংলা শেখানোর প্রিয় গুরুদের কথা বললাম। দেখো, তোমারাও নাড়া বাঁধবে কিনা।

শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ খণ্ড ১ - ১০ (এখনো পর্যন্ত) থেকে নেওয়া ৩৪টি বইয়ের নাম। গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজোয় পুরুতের কাজটিই শুধু আমার।

১৫. বই সপ্তমীর শুরুতেই এদেশীয় দর্শনের একটি মোদ্দা কথা বলি, প্রত্যেকে আমরা একেকটা তেলের ডিপো। ক্রুড পেট্রোলিয়াম অয়েল, অথবা a Buddha with infinite potential. সমস্যাটা হলো - হয় আমরা তা জানি না, জানলেও মানি না, মানলেও বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করলেও কাজে লাগাই না।

আমরা অনেকটা potential well বা সম্ভাবনার কুয়ো, অনেকগুলো তার লেয়ার বা তল। পেট্রোলিয়াম এর নানান স্তরের আবডালে যেমন নানান ব্যবহার্য, আমাদের অস্তিত্বের নানান ঐশ্বর্য।

মনন - খাদের উপরের স্তরে জমা হয় পঞ্চেন্দ্রিয় মারফৎ, যেটুকু পাই, সেটুকু প্রাথমিক জানা, শোনা, দেখা, শেখা। আবেগ, অনুভূতি, বুদ্ধি ও বোধের স্তরগুলি এর পর পর।

আমার 'ভালো লাগার' কিছু যা কিছুই হতে পারে সেটাই, যা আমার খাদের অতলে নেমে, আমার পুরো আমিটাকেই ছুঁতে পারে। এভাবেই ভালো লেগে যায় কোন কবিতা, গান বা ছবি বা একটা মানুষকে।

অনেক কবিতা, গান জীবন-ই সেই অতল ছোঁয়া ভালো লাগার দলে।

অনেকেই তারা সংখ্যায়, কারণ আমার এই মনন অস্তিত্ব-তলের নাগাল পাওয়া খুব সহজ, কারণ ওই কুয়ো বা খাদটি নেহাতই অগভীর।

কিন্তু কটা কবিতা, গান, শিল্প আমাকে কুরে কুরে বলায় যে 'আমি তো এরকম করে বলতে পারিনি।'

কটা ভাবনা ভাবায় আমাকে যে 'কই, এমন করে তো ভাবতে পারিনি!'

কটা জীবনে হিংসে হয় যে 'এমন করে তো বাঁচতে শিখিনি।'

কজন আমার ভালো লাগাতেই থেমে থাকেনা, আমার 'ভালো লাগাটাকেই' ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়ে নিতে পারে?

কজন আমার খাদের গভীরতম স্তরটি স্পর্শ করেই ক্ষান্ত দেয় না, খুঁড়ে খুঁড়ে খাদের গভীরতাও ক্রমে বাড়ায়, বাড়িয়েই চলে- অসীম অতলে, অসীম সম্ভাবনার দিকে?

জীবনের গভীরে এই খনন অবিরাম, শুরুহীন সময় থেকে যার শুরু, অন্তহীনতায় যার শেষ - তারই তো নাম জীবন। ধূম লেগে যায় হৃৎকমলের জীবন। হৃদয়ের গভীরতর এই চুপকথাদের রূপকথা'র আরেক নাম 'পুণ্ডরীক (পদ্ম) সূত্র বা The Lotus Sutra'.

১৬. রঙ আর আলো কে আলাদা করে ভাবা যায় না।

আলো হোল ফিল্ডের কম্পন মানে তরঙ্গ বা ঢেউ,

বেগে দ্রুততম, নানান রঙে রঙিন। তা এই রঙ কে ঠিক করে দেয়? একক সময়ে কম্পন সংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি, যা কি না আবার আলোর শক্তিও বেঁধে দেয় - আলো যখন চরিত্র বদলে তরঙ্গ থেকে কণার চেহারা নেয়। মজার কণা, ভর হীন কণা। কণা, আবার ঢেউ-এ কি তবে আলোর দ্বিচারিতা? না কি আলো তার অস্তিত্বের গভীরে কোথাও, দুইয়ে মিলে আসলে এক ও অনন্যা। অলোর জন্মই তো দুইয়ের চুম্বনে-বিদ্যুৎ আর চুম্বক। দুইয়ে মিলে এক হয়ে যাওয়া নেহাতই প্রাকৃতিক।

এতো কিছু না জানলেও তোমার রঙিন হওয়া আটকাবে না, শুধু হৃদয়ের কম্পনটা ধরে রাখতে হবে, তাতে যত বৈচিত্র আনবে, ততই রাঙা হয়ে উঠবে তুমি। তাতে ভাইরাস নেই, দূষণ নেই, খরচা নেই, ধারের কারবার নেই, সবটাই টাটকা, নগদ-রঙের পাল্টা রঙ, আর কিচ্ছু না, শুধু হৃদয়ের রঙ - হৃদয়ই শেষ কথা হোক আজ।

১৭. ছোটো a b c d

বড় A B C D র থেকে

কিসে ছোটো?

বয়সে, গুণে, মানে নাকি অভিজ্ঞতায়?

ঠিক কতটা ছোট?

A বয়সে বড় a র থেকে। গুণে a বড় To save time and space, letters became smaller and more rounded and eventually evolved into the full set of small or lower case letters. They give more readability and ease in writing too. So they were used to be kept in 'lower case' in the type houses i.e., Press and the less frequently A B C D... in the 'upper case.'

এ তো গেলো গুগল জ্যাঠার ইতিহাসের কথা।

'দর্শন' আপনা আপনা...

রবীন্দ্রনাথের গান

সন্দীপন সেন
অধ্যাপক, ইংরাজি বিভাগ

আর্নেস্ট রিজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এক ইংরেজ কবি। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই তাঁর কবিতা শুনে রিজ বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আপাত বাস্তবতার অন্তরালে থাকা আদর্শ জীবনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে, যে বিশ্বাস তিনি তাঁর যৌবনে লালন করতেন।[১] ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীও লিখেছিলেন রিজ। তাঁর সেই বইতে তিনি একটি প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনি লিখেছেন, যে কাহিনি তিনি শুনেছিলেন এডউইন মন্টেগুর কাছে, যিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের এক প্রধান রাজপুরুষ। সে কাহিনি হলো এইরকম - মন্টেগু এক শীতের রাতে ভারতবর্ষের এক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, পথে তিনি দেখেন দু-তিনজন গরিব মানুষ শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আগুন জ্বেলেছে, আর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে একটি বাচ্চা ছেলে। তারপর তারা পালা করে পরপর গান গাইতে শুরু করে। বাচ্চাটির পালা এলে সেও একটি গান গাইল - সে গান বাকি সব গানের থেকে আলাদা, সবচেয়ে সুন্দর। বাচ্চাটি অবশ্য জানত না সে গান কার লেখা, সে শুধু বলেছিল এ গান না কি সবাই সব জায়গায় গায়।

মন্টেগু সাহেব পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন যে সে গান না কি ছিল রবীন্দ্রনাথের গান।

আরও পরে অবশ্য জানা গেছিল যে আর্নেস্ট রিজ একটু ভুল লিখেছিলেন - মন্টেগু এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, তিনি এ ঘটনা অন্য একজনের মুখে শুনেছিলেন, তাই এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মুশকিল।[২] প্রায় এমনই একটা তথ্য দিয়েছিলেন আরেক ইংরেজ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স্, যিনি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি-র ভূমিকা লিখেছিলেন। তাঁর সেই ভূমিকায় এক বাঙালি চিকিৎসককে উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন যে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত যেখানেই বাঙলাভাষী আছে সেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হয়।[৩] বলা বাহুল্য, সে সময়ে ভারতবর্ষ অবিভক্ত ছিল - তাই এই বয়ান অনুযায়ী বলতে হয় যে বর্তমান কোয়েটা থেকে বর্তমান মিয়ানমার পর্যন্ত যেখানেই বাঙলাভাষী ছিলেন সেখানেই রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হতো। ইয়েট্‌স্ তাঁর লেখায় লেখেন নি ঠিক কোন বাঙালি চিকিৎসকের মুখে তিনি এ কথা শুনেছিলেন - তবে আমরা জানি সেই চিকিৎসক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

মন্টেগুর শোনা কাহিনির মতো দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রর বয়ান সম্বন্ধেও যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে- কোয়েটা থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত সব বাঙলাভাষী অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হতো এ কথা বেশ খানিকটা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। তবে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত - অতিরঞ্জনের মধ্যে প্রায়শই সত্যের একটা নির্যাস লুকিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর্নেস্ট রিজ বা ইয়েট্‌স্ যা লিখেছেন তা রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় - তিনি ছিলেন সে যুগে বাঙলা তথা ভারতের মহত্তম কবি। এই কাহিনি দুটির মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায় -- দুটি কাহিনিতেই রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের কবি হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছেন, যাঁর গান সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এই ছবি পুরোপুরি সঠিক না হলেও বাঙলার ইতিহাসে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গান সত্যিই সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরত - সে সময়টা ছিল বঙ্গভঙ্গ -

পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলনের সমসাময়িক কাল - প্রায় একমাস ধরে তেইশটি অবিস্মরণীয় দেশাত্মবোধক গান লিখে[৪] তিনি বাঙলার মানুষকে পথে নামিয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তিনি যথার্থ চারণকবির ভূমিকা নিয়েছিলেন,[৫] মার্কিন - ইংরেজ কবি এজরা পাউন্ড বলেছেন সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু গান গেয়েই বাঙালি জাতিকে গড়ে তুলেছিলেন[৬] - তাই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে যথার্থই জনগণের কবি হয়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে সংশয় না থাকারই কথা। এখানে একটা বিষয় বলতে হয় - রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তাঁর কবিতার পার্থক্য খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে, বিশেষত তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথমার্ধে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার ইন্দিরা দেবীকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর প্রথম জীবনের গানগুলি 'ইমোশনাল'[৭] - এই ইমোশন বা আবেগের তোড়েই ভেসে গেছে গান ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য। এ কথা আরও ভালো করে বোঝা যায় যদি আমরা স্মরণ করি যে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা-সংকলনের শিরোনামে গান বা গানের অনুষঙ্গ উপস্থিত - যেমন সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান, গীতাঞ্জলি, গীতালি প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের গান পৃথিবীতে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ অজরামর হয়ে থাকবেন তাঁর গানের জন্যে, যে গান মৃত্তিকার বন্ধন থেকে আমাদের নিয়ে যায় নীলাম্বরের মর্মমাঝে।[৮] আমাদের অনেকেরই মনে পড়বে যে বুদ্ধদেব বসুও এমনটাই বলেছেন - রবীন্দ্রনাথের গান মরত্ববিদ্ধ জগৎ থেকে আমাদের পৌঁছে দেয় ভগবানের দ্বারপ্রান্তে।[৯] যাঁরা ভগবানে অবিশ্বাসী, তাঁদের জীবনেও রবীন্দ্রনাথের গান কীভবে এক জাদুর ছোঁয়া বুলিয়ে দেয় সে প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব থেকে শঙ্খ ঘোষ বা রণজিৎ গুহ - অনেকেই।[১১] তাঁর গানের এই অসামান্য রূপ বোধহয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝতেন - আর তাই তিনি একটা কথা একাধিকবার বলেছিলেন একাধিকভবে। তিনি বলেছিলেন তাঁর গান - তাঁর বাকি সব সৃষ্টি যদি মুছেও যায়, সুখে দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় বাঙালি সারাজীবন ধরে তাঁর গান না গেয়ে পারবে না।[১২] আমাদের সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের কোনও সৃষ্টি মুছে যায় নি, আর তাঁর গান এখন বাঙালির জীবনে এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের গান একটা অন্য স্থানও অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথ কখনও ডায়েরি বা দিনলিপি লেখেন নি - বস্তুত, ডায়েরি লেখার বিষয়ে তাঁর একটা অস্বস্তি ছিল, তিনি ভয় করতেন তাঁর ডায়েরি যদি ভবিষ্যতে অন্য কারোর হাতে পড়ে তাহলে হয়তো তাঁর দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য তাঁর সারা জীবনের সত্যকে মাটি করে দিতে পারে - যে কথা তিনি লিখেছেন তাঁর পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি-তে।[১৩] মংপুতে বসে মৈত্রেয়ী দেবীকেও বলেছিলেন ডায়েরি লিখলে অবাঞ্ছিত লোকের হাতে তাঁর জীবনের তথ্য চলে যেতে পারে।[১৪] কিন্তু, মজার কথা হলো রবীন্দ্রনাথ ডায়েরি না লিখেও তাঁর অন্তর্জীবনের অনেক তথ্যই আমাদের জানিয়ে গেছেন - আর তা জানিয়েছেন তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথের গানের ধারাকে অনুসরণ করলে তাঁর জীবনের বৃত্তান্ত অনেকটাই জানা যায়। তার সম্ভাব্য কারণ আমাদের জানিয়েছেন ক্ষিতিমোহন সেন, তিনি আমাদের জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যখন গান লিখতেন তখন তিনি খোলস-ছাড়ানো মানুষ হয়ে যেতেন - নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতেন।[১৫] তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন, 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়', কিংবা প্রবল অবসাদরোগে আক্রান্ত হয়ে যখন তিনি আত্মহননের চিন্তা করেছিলেন তখন লিখেছিলেন 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি' - এভাবেই তাঁর গানের মধ্যে দিয়েই জানা যায় তাঁর অন্তর্জগতের ইতিহাস।

তবে সে ইতিহাস অনেকটা জানা যায় বটে, কিন্তু পুরোটা নয় - কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অলৌকিক প্রতিভাবান পুরুষ আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে বারবার ফাঁকি দেন। তাই, আমরা জেনে চমকিত হই যে মৃত্যুর মাত্র বছর দুয়েক আগে আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ লিখেছিলেন তাঁর এক গানের এক বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি - যে পঙ্‌ক্তিতে জড়িয়ে আছে যৌবনের প্রেমের আর্তি - 'মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে'। আবার মাত্র ছাব্বিশ বছরের যুবক লিখেছিলেন 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে' গানখানি, যে গানে জীবনান্তের ছবি স্পষ্ট। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে ওঠে বোঝা না বোঝায় মেশা আরেক বিদ্যুৎলতা।

তথ্যসূত্র

১. কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন, রবীন্দ্রনাথ টেগোর ঃ *দি মিরিয়াড মাইন্ডেড ম্যান*, নিউ দিল্লি, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০০ পৃ. ১৭৯

২. নিত্যপ্রিয় ঘোষ, জ্যোতির কনকপদ্ম, কলকাতা ঃ কারিগর, ২০১৫, পৃ. ৯-১০

৩. রবীন্দ্রনাথ টেগোর, গীতাঞ্জলি, কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ২০০৪ পৃ. ২৬১

৪. নিত্যপ্রিয় ঘোষ, জ্যোতির কনকপদ্ম, কলকাতা ঃ কারিগর, ২০১৫, পৃ. ৯ - ১০

৫. কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৬. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চমখণ্ড , কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫৯

৭. কৃষ্ণ কৃপালনি, টেগোর ঃ এ লাইফ, নিউ দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৭, পৃ. ১১৩

৮. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, রবীন্দ্রস্মৃতি, কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭

৯. সৈয়দ মুজতবা আলী, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯

১০. বুদ্ধদেব বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০, পৃ. ৭৫

১১. এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের গান ঃ জাগরণ আর হাহাকারের গান', রবীন্দ্রনাথ ও ইংরেজ শাসন ঃ কালান্তরের বৃত্তান্ত, কলকাতা ঃ অনুষ্টুপ, ২০১৯

১২. রানী চন্দ, আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিম- যাত্রীর ডায়েরি, রবীন্দ্ররচনাবলী, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০ - ২০০৪), একাদশ খণ্ড, ১৯৮৯, পৃ. ২১

১৪. মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা ঃ প্রাইমা পাবলিকেশনস, ২০১৩, পৃ. ১০৬

১৫. সুধীর চক্রবর্তী, নির্জন এককের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত, কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮

মাটির দুর্গা

অনন্যা দাশগুপ্ত
সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা

'ও বাবা, বাবা! আমাকে তোমার দুর্গা বানাবে? বানাও না অমন শক্তিময়ী, যেমন করে গড়ে তোলো মাটির মা-দুর্গাকে।'

আহিরীটোলার কুমোরটুলির অপূর্ব একজন প্রতিমা কারিগর। নিবিষ্ট মনে প্রতিমা গড়ছিলো। সকাল থেকে এঁটেল মাটি ছেনে, বিচুলি-খড় বাঁশের চটা দিয়ে বাঁধাছাঁদা। কোনদিকেই তাকানোর ফুরসৎ নেই। কাজের চাপ বেড়েছে। চাহিদা জোগান দিতে হবে সময়মতো। তা না হলে গ্রাহক অসন্তুষ্ট হবে। বদনাম হয়ে যাবে তার কাজের। দীর্ঘদিনের ব্যবসা তাদের বংশ পরম্পরায়।

অপূর্বর হাতযশ ভালো। গড়ে বড্ড নিখুঁত করে। দেখলেই মনে হবে যেন প্রাণময়ী কোন নারী দম আটকে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্বর একটাই মেয়ে। বয়স দশ। দেখতে ভীষণ মায়াময়। কাজলকালো ডাগর হরিণী দু'চোখ; মাথায় লম্বা চুলের বিনুনী। বড্ড আদুরে প্রাণবন্ত হাসি ছড়ানো মূর্তিমান মা-দুর্গা।

''ঠিক আছে মাগো! এ বছরের প্রতিমাটা তোমার আদলেই গড়বো।''

'মায়ের শক্তিটুকুও আমি পাবো বাবা?'

'তা পাবে বৈকি!

শক্তিরূপিনী যদা যদা নমস্তুতে মা দুর্গা

দুর্গতিনাশিনী।'

'আমি তাহলে জরা-ব্যাধি জয় করতে পারবো বাবা?'

মা-দুর্গার মুখ গড়তে ডুকরে কেঁদে ওঠে অপূর্ব। গতবছর করোনার থাবায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভুগে মেয়েটা চলে গেছে না ফেরার দেশে। অপূর্বর বুকটা দুমড়ে আসে।

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে অপূর্বর দু'চোখ। জলের প্রতিটা ফোঁটায় ভেসে আসে মেয়েটার মুখ। জলের বিন্দুতে একটা মুখ হাজারটা মুখ হয়ে ছড়িয়ে থাকে চারিদিকে।

পাঠাগারে ছাত্র এবং শিক্ষকগণ।

শিক্ষকদের বসার ঘর।

অফিস ঘর

অফিস ঘর

পরীক্ষাগারে ছাত্র ও শিক্ষক

অতিমারি আবহে গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্তির আশ্বাস
বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

হিন্দি দিবস উদযাপন

হিন্দি দিবস উদযাপন

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বৃক্ষরোপণ

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

বিশ্ব এইড্‌স দিবস উপলক্ষে সমাজ সচেতনতা অনুষ্ঠান

বিজ্ঞান সমাগমে ছাত্ররা

NSS আয়োজিত কোভিড-১৯ সচেতনতা অনুষ্ঠান

শিক্ষক দিবস উদযাপন

শ্রেণিকক্ষে পাঠরত ছাত্রছাত্রীগণ

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পদার্থবিদ্যা বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা 'বং-বেরং'-এর প্রকাশ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গ্রন্থ প্রকাশ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

বনভোজনে শিক্ষকগণ

বনভোজনে শিক্ষকগণ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

Ananya Das Gupta
Zoology (H)
3rd Sem

Beauti Chaudhury
BA

Raju Kumar Das,
BA(H), Sem-3

Subhajit Jana
B. Com (H), Sem-5

Beauti Chaudhury
BA

Subhajit Jana
B. Com (H), Sem-5

শান্তির দূত বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং

তপনকুমার মৈত্র
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

কয়েক বছর আগে 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকা সর্ব কালের সেরা কুড়ি জন বিজ্ঞানীর এক তালিকা বানিয়ে ছিলেন। সারাব্যান্ড প্রকাশনও সর্ব কালের সেরা কুড়ি জন জিনিয়াস বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন। দুটি তালিকাতেই ছিল বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং এর নাম। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সেরা দুজন বিজ্ঞানীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। অপরজনের নাম ছিল আলবার্ট আইনস্টাইন। সর্ব কালের সেরা দুজন রাসায়নবিদের মধ্যেও ছিল তাঁর নাম। অপরজন ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর আধুনিক রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী ল্যাভসিয়ের। এসব তালিকা ও মতামত নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু দুটি ভিন্ন বিষয়ে একক ভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যে মানুষ তাঁর প্রতিভা এবং অবদান যে প্রশ্নাতীত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন পর্যন্ত মাত্র চারজন মানুষ দুবার করে নোবেল জয়ীর সম্মান পেয়েছেন।পাউলিং ছিলেন এই চারজনের একজন। প্রথমেই বলি পাউলিং এর বিজ্ঞানে অবদানের কথা। ১৯৫৪ সালে পাউলিং রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি এবং জটিল পদার্থের গঠন নির্ধারণে এর ব্যবহারের বিষয়ে গবেষণার জন্য। ১৯৩৯ সালে তিনি এই বিষয়ে 'দি নেচার অফ দি কেমিক্যাল বন্ড' নামে এক বই লেখেন । অধিকাংশ রসায়নবিদদের মতে এই কাজটি হল বিংশ শতাব্দীতে রসায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি নির্ধারণে তিনি 'ইলেক্ট্রো নেগেটিভ স্কেল' নামের এক সহজ ব্যবহারিক মাপনীর আবিষ্কার করেন। এই বইতে তিনি পরমাণুর মধ্যের ইলেকট্রনের কক্ষপথের বিষয়ে এক নতুন ধারণার জন্ম দেন যা রসায়নের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ইলেকট্রন সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের কক্ষ পথে পরমাণুর মধ্যে ঘুরপাক খায়। কিন্তু এমন ধারণার দ্বারা মিথেনের মধ্যে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের একই রকমের বন্ধনীর ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছিল না। পাউলিং বিভিন্ন ধরনের কক্ষপথের মধ্যে সংকরনের এক ধারণা দিয়েছিলেন যা এই অমীমাংসিত প্রহেলিকার অবসান ঘটিয়েছিল। এমনই আরেক অমীমাংসিত রহস্য ছিল কার্বন ডাই অক্সাইডে কার্বন-অক্সিজেন বন্ধনীর দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে। পাউলিং, এর সমাধানে অনুরণন অর্থাৎ 'রেসোন্যান্স' তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন।

যুগান্তকারী এই কাজের পর বিজ্ঞানী পাউলিং ওনার গবেষণার মোড় ঘোরালেন সম্পূর্ণ অন্যদিকে। শুরু করলেন জীবদেহের কর্মকাণ্ডের আণবিক ভিত্তির সন্ধান। হিমোগ্লোবিনের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৩০ এর কাছাকাছি সময়ে তিনি প্রোটিনের অবক্ষয়ের বিভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত করেন। ১৯৪০ সালের মধ্যে বিজ্ঞানী ম্যাক্স ডেলব্র্যাকের সঙ্গে মিলে অনাক্রম্যতা অর্থাৎ ইমিউনিটির একটি মডেল উপহার দেন। বিজ্ঞানীদ্বয় দেখান রোগের কারণ আক্রমণকারী অ্যান্টিজেনের কুলুপ এঁটে দেয় শরীরে তৈরি হওয়া অনঙ্গক অর্থাৎ অ্যান্টিবডি পরস্পরের পক্ষে উপযুক্ত এক বিশেষ রাসায়নিক

মানানসই প্রক্রিয়ায়। এনজাইমের কার্যপদ্ধতির গবেষণায়ও তিনি অনেক নতুন দিকনির্দেশ করেন। পাউলিং এর পরিব্যক্তিশীল জিন অনেক সময় শরীরে কুগঠিত প্রোটিন তৈরি করে এবং এর ফলে বংশাণুধৃত রোগের উদ্ভব হয়। এর উদাহরণ হিসাবে তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা প্রমাণ করে দেখান যে 'সিকেল সেল অ্যানিমিয়া' রোগের কারণ হল রক্তের লোহিত কণিকায় অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস পি কোলম্যানের মতে পাউলিং-এর সব গবেষণারও ভিত্তি।

বিজ্ঞানী পাউলিং এর আরেকটি বড় কৃতিত্ব ছিল 'ইলেক্ট্রোফোরেসিস' পদ্ধতির প্রয়োগ করে বৃহদাকার জটিল প্রোটিনকে আলাদা আলাদা ছোট অংশে পরিণত করে তার বিশ্লেষণ করা। তিনি এবং বিজ্ঞানী কোরেই প্রথম এক্স রে রশ্মির অপবর্তন ব্যবহার করে অনেক বৃহদাকার প্রোটিনের গঠন যে হেলিক্যাল বা স্পাইরাল তা বলেন। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার কেননা এই দিকনির্দেশ পরবর্তীকালে প্রাণের মূল ভিত্তি ডি এন এর গঠন আবিষ্কারের সাহায্য করেছিল। অনেক বিজ্ঞানীর মতে ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডে যে প্রোটিন সম্মেলন হয়েছিল তাতে যাওয়ার পাসপোর্ট আমেরিকার সরকার আটকে না দিলে ডি এন এর গঠন আবিষ্কারেও বিজ্ঞানী পাউলিং এর নাম থাকত। রসায়নবিদ্যাকে বদলে দেওয়া এইসব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার আরও অনেক অবিষ্কারের পাশাপাশি পৃথিবীকে এক শান্তির গ্রহ বানানোর জন্য তাঁর অনলস প্রচেষ্টা মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। এবারে তাই আসি পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে তাঁর অবদানের কথা। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র জনগণের অধিকার, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে গবেষণার জন্য প্রদত্ত অনুদান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এমনকি পাসপোর্টও আটকে দেওয়া হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ সফরের আগে। বহু রকমের সরকারি হেনস্থার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল তাঁকে। এই সময়ে 'ক্যালটেক' যেখানে তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা 'আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি' ১৯৪৯ সালে তিনি যেখানকার সভাপতি ছিলেন কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু তাতে দমে যাননি এই মহান বিজ্ঞানী। যদিও এসবের মোকাবিলা করতে গিয়ে তাঁকে বিস্তর সময় নষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে জীবনে কখনও কোন আফসোস করেন নি তিনি। তিনি বলতেন তৎপরতার জন্য যদিও কিছু বিজ্ঞানী এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে বিজ্ঞানী হিসাবে আমার খ্যাতি কমে গেছে কিন্তু তাতে আমার কোনও খেদ নেই'। তিনি মনে করতেন শান্তি প্রচেষ্টার কর্মকাণ্ডে তাঁর এই কাজ মনুষ্য-জাতির কাছে তাঁর অন্যতম বড় অবদান। ১৯৪৬ সালে তিনি 'এমারজেন্সি কমিটি অফ অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট' এ যোগ দেন। আইনস্টাইন ছিলেন এই সমিতির চেয়ারম্যান। নিউক্লিয়ার বোমার বিপদ সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য।

১৯৫৫ সালে আইনস্টাইন, বারট্রান্ড রাসেল ও আরও আটজন বিখ্যাত পণ্ডিত মানুষদের সঙ্গে স্বাক্ষর করেন 'রাসেল আইনস্টাইন ম্যানিফেস্টো'তে। ১৯৫৮ সালে পাউলিং 'সিটিজেন'স কমিটি ফর

নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধের আবেদন সম্বলিত সারা পৃথিবীর ৯২৩৫ বিজ্ঞানীর এক দরখাস্ত রাষ্ট্র সংঘে পেশ করেন। এই বছরই নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপদ এবং শান্তির স্বপক্ষে তাঁর গবেষণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির কথা লিপিবদ্ধ করে 'নো মোর ওয়ার' নামের একটি বই প্রকাশ করেন। বিশ্ব শান্তি স্থাপনে তাঁর এই অনলস চেষ্টার পুরস্কার পেলেন তিনি দ্বিতীয় বার নোবেল পেয়ে। ১৯৬২ সালে নোবেল কমিটি শান্তির জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করেন। এরপরেও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি সবসময় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা থেকে শান্তির জন্য গবেষণার প্রস্তাব দেওয়া সব কিছুতেই তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে।

অসাধারণ জিনিয়াস এই একগুঁয়ে মানুষটি ছিলেন অদ্ভুত রকমের রসিকও। তাঁর এই রসিকতার অসংখ্য উদাহরণের দুটির কথা বলছি। ১৯৩৮ সালে বার্কলের ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অসাধারণ বক্তৃতা ও তাঁর পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব খুব ভালোভাবে সারার পরে মোহিত এক তরুণ বিজ্ঞানী বলেন, 'পাউলিং এর নিশ্চয় ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সংযোগ নল আছে।' রসিকতা করে তিনি তাই পাউলিং এর নাম দেন পোপ লাইনাস ওয়ান। পাউলিং রসিকতার উত্তর দেন, রসিকতা করেই বলেন, এরকম পোপ লাইনাস আরও আছে। কাজেই একনম্বর বলাটা ঠিক হবে না। ঘটনাটির কথা স্টানফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক সভায় জানিয়েছিলেন নোবেল জয়ী আরেক বিজ্ঞানী হেনরী টুবে। আরেকবার তরুণ বিজ্ঞানীদের এক সভায় তিনি বলেন, ' আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমার স্মৃতিশক্তির দুটি অধিকোষ আছে। যখনই আমি কিছু ভুলে যাই আমি আমার সহায়ক অধিকোষের সাহায্য নিই অর্থাৎ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি। অনেক সময় নানা নতুন ধারণাও পাই এই অধিকোষ থেকে। এটি পাই আমি স্ত্রীর কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে। তাই তোমাদের আমার পরামর্শ - তোমরাও সারাজীবন ধরে পাওয়া যাবে এমন সহায়ক অধিকোষের ব্যবস্থা করে ফেলো।' সর্ব কালের সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম শান্তির দূত একগুঁয়ে আপামর রসিক এই মানুষটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানী এইচ ম্যাককনেল যথার্থই বলেছেন, তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের এক বিজ্ঞানী, শান্তির এক মহান প্রবক্তা। বাংরবার তিনি বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন আর প্রায়শই প্রমাণিত হয়েছে যে তিনিই সঠিক।

শোভা সিং ঃ বর্ণ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস ও বাগদি কৃষক বিদ্রোহ

মিলন রায়
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

প্রাক ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলায় সংগঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ জমিদার - কৃষক বিদ্রোহ হল শোভা সিংহের বিদ্রোহ। ১৬৯৫ - ৯৭ খ্রীঃ বর্ধমানের মহারাজার অধীন মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা মহকুমার বাগদিপ্রধান চিতুয়া বরদা-বা চিত্রবরদা (ঘাটালের দাসপুর অঞ্চল) পরগনার জমিদার শোভাসিংহের নেতৃত্বে মোগল শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা বাগদি কৃষকদেরই বিদ্রোহ।[১] মেদিনীপুরের এই অঞ্চলটি বাগদিপ্রধান এবং তারা নিজেদেরকে বর্ণক্ষত্রিয় বলে প্রচার করে থাকেন এবং আমরা বাগদি সম্প্রদায়ের সামাজিক কার্যকলাপে শোভা সিংহের বিশেষ প্রতিপত্তি দেখতে পাই। শোভা সিং এর বিশালাক্ষী দেবীর উৎসবেও আমরা বাগদি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই।[২] কথিত আছে শিবায়ন কাব্য রচয়িতা কবি রামেশ্বরের পরিবারের সঙ্গে শোভা সিংহের বিরোধের মূল কারণ ছিল - রামেশ্বরের বংশপুরুষ শোভা সিংহের পুজায় অংশ গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। মেদিনীপুরের ঐ অঞ্চলে শোভা সিংহ একাধিক মন্দির নির্মাণ করেন যেখানে সমস্ত ধর্মের মানুষ পূজার্চনা করত। এছাড়া তিনি একাধিক জলাশয় খনন করান যেগুলি প্রচুর মানুষের পানীয় জলের জোগান দিত। শোভা সিংহ নিম্নবর্ণের মানুষ হয়েও একাধিক উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। দাশপুর থানায় রাধাকান্তপুর গ্রামের মন্দিরগাত্রের লিপি থেকে জানা যায় যে, মজুরদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জনানন্দ দাশের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয় কিন্তু তার অলৌকিক কাজে মুগ্ধ হয়ে শোভা সিং ঐ পরিবারকে প্রচুর জমি দান করেন। দ্বিজ হরিরাম তার আদ্রিজামঙ্গল শোভা সিংহের আনুকূল্যে রচনা করেন। শোভা সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন।[৩] এগুলি মূলত তাঁর বর্ণসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস বলা যেতে পারে।

শোভা সিংহের পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। অনেকে শোভা সিংকে চন্দ্রকোনার রঘুনাথ সিংহের অধস্তন পুরুষ বলে মনে করেন। দাশপুরের একটি মন্দিরের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে শোভা সিংহকে নিষ্ঠুর মানুষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে রামেশ্বরের কবিতায় এবং নারী আসক্তি সম্পর্কে নানা লোককথাতে শোভা সিংহের চরিত্রের নানা দিক চিত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় জনসমাজে প্রচলিত নানা কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায় শোভা সিংহের সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে শক্তিশালী বাগদি সম্প্রদায়েরও সমর্থন ছিল। শোভা সিংহ চিতুয়া-বরদা-র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলি থেকে কয়েক হাজার বাগদি পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করেন। এই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়েই বাংলার বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিক শক্তির প্রথম

সশস্ত্র সংঘাত ঘটে।[৪] বাঁকুড়া জেলার চুয়াড়দের মধ্যে যে কোনো সময় বিদ্রোহের সম্ভাবনার ভয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।[৫] মোগল শাসনকালেও উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে অস্ত্র ধারণ করেছিল।[৬] ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ায়, বহু নিষ্কর জমি স্থানীয় জমিদারদের আশ্রিত পাইক-বরকন্দাজদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে গোটা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ জুড়ে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে, তাই ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত।[৭] ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কোম্পানি এই বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করেন। বহু ক্ষয়ক্ষতি ও জীবননাশের পর এই বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতেই মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ জুড়ে আদিবাসী কৃষকদের যে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়েছিল তাকে ইংরেজরা বগড়ীর নায়েক হাঙ্গামা (১৮০৬-১৬) নাম দিয়েছিল। বগড়ী পরগণার আদিবাসীদের বলা হত নায়ক বা লায়েক বা বাগদি। তারা বাগড়ীর জমিদারদের পাইক বা বরকন্দাজরূপে কাজ করতেন এবং তার বিনিময়ে জমিদারপ্রদত্ত জায়গীর ভোগ করতেন। বগড়ীরাজ রাজ্যচ্যুত হলে তার অধীনস্থ জমিগুলিও ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে। এর ফলে নায়কগণের পাশাপাশি কৃষকরাও ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিল।

ইংরেজদের সর্বব্যাপী ক্ষুধা-ও উৎপীড়নই যে বাগদিদের বিদ্রোহের পথে চালিত করেছিল তা তৎকালীন কালেক্টর স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন - প্রাচীন কাল থেকে যারা জমি ভোগদখল করে আসছিল সেই জমি যখন বিনা কারণে, বিনা অপরাধে কেড়ে নেওয়া হয় তখন তারা বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধারণ করবে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া জীবনরক্ষার আর কোনো পথ তাদের কাছে খোলা ছিল না। লুণ্ঠন দস্যুতাকেই তারা জীবিকা অর্জনের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৮]

অনেকে শোভা সিংকে বাগদি ও বহিরাগত ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেন। চন্দননগরের ফরাসীদের লেখা পত্রে শোভা সিংহের পরিবারকে 'সম্ভ্রান্ত পরিবার' বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে শোভা সিংহ ইজারাদার হিসাবে বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায়কে বার্ষিক ২২,০০০ টাকা প্রদান করতেন। তবে এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর থাকায় সুস্পষ্টভাবে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। তবে একথা সত্য যে, তিনি তাঁর এলাকায় বাগদি প্রজাদের ওপর ভিত্তি করে বর্ণ সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছিলেন।[৯] ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যার পাঠানদের সাহায্যে তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করে চেতুয়া বরদার ভূস্বামী শোভা সিংহ বর্ধমান রাজ্য দখল করেন।[১০] শাসনক্ষমতা দখল করে তিনি একাধিক জনকল্যাণকারী কাজ করেছিলেন। ঐ অঞ্চলে একাধিক জলাশয় দেখতে পাওয়া যায় যা তিনি খনন করেছিলেন, তেমনি তাঁর দ্বারা আয়োজিত বিশালাক্ষী দেবীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে বাগদি সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে তিনি উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের জমি দান করলেও বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নতি বিধানের তেমন কোনো চেষ্টা করেন নি। উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁর নেতৃত্বে পাঠান সৈন্যরা যোগদান করলে শোভা সিংহের বাহিনী শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[১১] ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়ে শোভা সিংহের মৃত্যু হয়। যদিও তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একাধিক

মত প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে শোভা সিংহের মৃত্যু সম্পর্কে কৃষ্ণরামের কন্যার ছুরিকাঘাতকে দায়ী করেছেন। অপর একটি প্রচলিত মত অনুযায়ী শাহজাদা আজিমুদ্দিন ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে শোভা সিংহকে হত্যা করেন। তবে বিভিন্ন যুক্তির নিরিখে এই দুটি মতের কোনটিই সঠিক মনে হয় না। তবে শোভা সিংয়ের মৃত্যুর পর পাঠানরা লুঠতরাজের মাধ্যমে তাদের জনসমর্থন হারাতে শুরু করেছিল। তাদের কাছে ক্ষমতা দখল ও প্রজাদের উন্নতির চেয়ে লুঠতরাজই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু সহজ সরল বাগদি সৈন্যদের এরকম উদ্দেশ্য ছিল না।[১২] তারা তাদের মতোই বিভিন্ন হতদরিদ্র উপজাতি ও তথাকথিত বিভিন্ন নিচু সম্প্রদায়ের বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আজিমুশাসনের সুবাদারি আমলে এই বিদ্রোহকে ধ্বংস করা হয়।

এই বিদ্রোহে কয়েকটা দিক সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, জাতে ওঠার মানসিকতা ও লুঠতরাজের প্রবণতা থাকলেও দরিদ্র, উৎপীড়িত বাগদি সম্প্রদায় তাদের অত্যাচারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা একটি স্থায়ী শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। এইরকম বিদ্রোহগুলিকেই সাবালটার্ন গবেষকরা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত জাতীয় সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৩] ঔপনিবেশিক শাসনের উৎপীড়নের বিভিন্ন দিক যেমন খাজনা বৃদ্ধি, জমি থেকে উচ্ছেদ, দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যাগুলি তুলে ধরেছিল, তাই এই বিদ্রোহকে 'অন্ধবিদ্রোহ' বলে অবহেলা করা উচিত নয়।[১৪] বাংলার অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শোভা সিং ও বিশ্বনাথ বাগদির বিদ্রোহের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।[১৫] শোভা সিং এর বিদ্রোহ ও তাঁর সফলতা বাগদি সম্প্রদায়ের চিরাচরিত অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধন না করলেও ইউরোপীয় বণিকদের কাছে এই বিদ্রোহ তাদের নিজস্ব আত্মরক্ষার ক্ষেত্র নির্মাণ করে। ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ বণিকরা কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় তাদের প্রধান দুর্গ নির্মাণ ও তা সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে উপলব্ধি করে।[১৬] এর ফলে তারা পরবর্তী কালে অতি-রাষ্ট্রিক সুবিধা লাভ করেছিল। তারই ফলশ্রুতিরূপে ১৬৯৮ খ্রীঃ ইংরেজ শক্তি তিনটি গ্রামের (গোবিন্দপুর, সুতানটি, কলিকাতা) স্বত্বলাভ করে এদেশে তাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করে।[১৭] তাই শোভা সিংহের নেতৃত্বে 'বাগদি বিদ্রোহ'কে সামান্য একটি তুচ্ছ ঘটনা বলে অভিহিত করা যায় না।[১৮] নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মেদিনীপুরের বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষদের বিপথে চালিত না করলে তাদের ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হত। বাগদি সম্প্রদায়কেও আজ মরা পেতাম অন্যরূপে, অন্য মহিমায়।

সূত্র নির্দেশ

১. বসু যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১ম সং, সদেশ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ২০২-২০৪।

২. ভদ্র গৌতম, মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, হাওড়া ১৪২, পৃ. ১৩৩।

৩. ভদ্র গৌতম, তদেব, পৃ. ১৩৩।

৪. রায় সুপ্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৫. সেনগুপ্ত প্রমোদ, নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১৯৬০, পৃ. ১৪২।

৬. রায় সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা, রাডিক্যাল, ২০১২, পৃ. ৫৩-৫৪।
৭. বসু যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১ম সং, সদেশ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ২০২-২০৪।
৮. প্রাইস জে. সি. চুয়াড় রেবেলিয়ান, রণজিৎ গুহ (এডিটেড) সাবালটার্ন স্টাডিজ, ভলিউম-২, কলিকাতা, ১৮৭৪, পৃ. ২।
৯. ভদ্র গৌতম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।
১০. চৌধুরী কমল, বাংলা বারোভুঁইয়া এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৯।
১১. ভট্টাচার্য তরুণদেব, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, ২য় সং, ফার্মা, কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১১৮।
১২. ভদ্র গৌতম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।
১৩. গুহ রণজিৎ, এলিমেন্টারি এসপেক্ট অব পিজান্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৮৬, পৃ. ২৯২-৯৩।
১৪. কবিরাজ নরহরি, অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬।
১৫. রায় অনিরুদ্ধ, সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ, কৌশিকী শারদীয়, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ২১২-১৩।
১৬. উইলসন সি. আর. আর্লি অ্যানালস অব দ্যা ইংলিশ ইন বেঙ্গল, ভলিউম-১, বিমলা পাবলিশিং হাউস, নিউদিল্লি, ১৯৮৩, পৃ. ১৪৭।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর, পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্টাল ব্ল্যাকসোয়ান, নিউ দিল্লী, ২০১৬, পৃ. ১৪৭।
১৮. চ্যাটার্জী অঞ্জলি, বেঙ্গল ইন দ্যা রেন অব আওরঙ্গজেব, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ক্যালকাটা। ১৯৬৭, পৃ. ৩৪।

এক তরুণের লেখক হওয়ার গল্প

তুষার পাত্র
কলা বিভাগ

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অসামান্য এবং শক্তিশালী তরুণ লেখক বিনয় সরকার তার জীবনে ভয়ঙ্কর একটা বছর নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বটতলী নামক ছোট্টো গ্রামে তরুণ লেখক এবং বাবা, মা ও ভাই-বোন নিয়ে পাঁচজন মিলে বাস করতেন। লেখক ছিলেন খুব গরিব ও শ্রমিক পরিবারের ছেলে। খুবই দুরবস্থাতে দিন কাটাতে হতো তাদের। বি. এ. জেনারেল নিয়ে পড়া এই তরুণ লেখকের প্রথম গল্প ছিল এটি -

বর্তমান যুগ বিভাগের মানবচেতনার এক অশান্তিকর ও ভয়ঙ্কর, ভীতসন্ত্রস্ত এক বছর এসেছিল তার ক্ষুদ্রতম জীবনে, এই কালো রাত্রির বছরটা ছিল ২০২০।

বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা সংসার চালাতে অক্ষম, এদিকে লেখকের পড়াশোনা, ছয়মাস অন্তর কলেজের ফিস জমা দেওয়া। এই অবস্থায় তাদের রোজগার একেবারে নীচে নেমে এসেছিল। তাই লেখক সিদ্ধান্ত নেয় শহরে গিয়ে কিছুদিন কাজ করে টাকা আয় করবে। তাই সে তার পরিবার নিয়ে রওনা দিল। কিছুদিন এইভাবে তাদের চলতে থাকে। একদিন হঠাৎ লেখকের বাবা লেখককে বলল বাবা! চল গ্রামে ফিরে যাই। লেখক বলল কেন আরও কিছুদিন থাকি না বাবা, লেখকের বাবা বিস্ময়ভরে চোখ কপালে তুলে বললেন 'ভাইরাস', এইমাত্র চায়ের দোকান থেকে টেলিভিসনে দেখে এলাম সারা বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাস আবিষ্কার হয়েছে। এই ভাইরাসের কোনো ঔষধ নেই নাকি? এইসব কথা শুনে লেখক কিছু না বলে মনে মনে ভাবে এই সব ভাঁওতাবাজি কথা, এই ভেবে সে কাজে চলে গেল। এর কিছুদিন পর আস্তে আস্তে এই করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকে। শহরে গাড়ি, ঘোড়া, রাস্তা, দোকান, কলকারখানা বাজার সব বন্ধ হয়ে যায়। শহরে কাজে গিয়ে ভাড়া বাড়িতে বসে থাকতে হয় কারণ সরকার লকডাউন ঘোষণা করে দিয়েছে। বাবা একটা মাস্ক দিয়ে লেখককে বললেন বাবা! এখানে থাকলে না খেতে পেয়ে মারা যাব চলো বাড়ি ফিরে যাই। লেখক বলল বাবা আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, গাড়ি ঘোড়া, ট্রেন সবতো বন্ধ, কী করে গ্রামে ফিরবো, এদিকে হাতেও কিছু অর্থ অর্জন করেছিল, তাও আস্তে আস্তে শেষ হতে থাকে। লেখকের চিন্তার কোনো শেষ নেই। কোথায় লেখক ভেবেছিলেন দুই পয়সা আয় করে কলেজের ফিস ও ভাইবোনদের মুখে হাসি ফোটাবে তা আর তার কপালে সইল না। এই দুর্দিনে একদিনে দুবার আহার করতে হচ্ছে। তাই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে লেখক একদিন গ্রামের দিকে রওনা দিল। হাজার কিলোমিটারের পথ, গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। নিঃস্তব্ধ রাস্তাঘাট জনমানব শূন্য। তাই পায়ে হেঁটে রওনা দিল লেখক। হাতে অর্থ নেই। সাথে ছোটো ভাইবোন খিদেয় কাতরাচ্ছে। রাস্তায় টিউবওয়েল থেকে পেটভর্তি করে জল পান করে তেষ্টা ও খিদে মিটিয়ে নেয়। তবু যেন মনে হয় গ্রামের আশায় লেখক পায়ের ক্ষমতাকে চলার জন্য শক্তি জোগায়। পথে নানা দুর্ঘটনা সত্ত্বেও অনমনীয় জেদ ও জীবন পিপাসার টানে বাকি পথ কালোরাত্রির নিশাচর প্রাণীর মতো অভিযান করছে। শেষপর্যন্ত লেখক নতুন সূর্যোদয়ের আশায় এই অভিশপ্ত রাতগুলো পার করে এসেছিল ঠিকই কিন্তু বেদনাতে সে লেখক হয়েই বেঁচে রইল। পত্রিকাতে তার লেখা পাঠিয়েছিল, গ্রামে এসে দেখলো, তার জন্য ক্যুরিয়ারে পত্রিকা আর চেক এসেছে বাড়িতে - ২০০ টাকার।

परम्परागत बेड़ियों को तोड़ती स्त्री की संघर्षगाथा: कस्तूरी कुण्डल बसै

डॉ रीना कुमारी
सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग

सृष्टि एवं सामाजिक संरचना का एक मुख्य कारक है- स्त्री, जो एक सर्जक की भाँति सम्पूर्ण मानव जाति को आकार देकर जैविक विकास की धारा को गतिमान रखने के लिए का कार्य करती आयी है। वह अपने सौम्य गुणों से पुरूष की उग्र भावनाओं का शमन करती है, कहीं विषम परस्थितियों में उसकी अनुगामिनी बन उसका मार्गदर्शन भी करती है, तो कहीं आवश्यकता पड़ने पर हाथ में क्रांति की मशाल लेकर आगे भी बढ़ी है। स्त्री की इसी आन्तरिक क्षमता एवं सामर्थ्य से अवगत होकर हमारे धर्म केन्द्रित पुरूष प्रधान समाज-व्यवस्था ने साजिश के तहत स्त्रियों की प्रतिभा एवं अस्मिता को धर्म, समाज, नैतिकता एवं परम्परा की बेड़ियाँ बनाकर जकड़ डाला। ताकि समाज में श्रेष्ठता का एकछत्र अधिकार उन्हें प्राप्त हो सके। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए इस बंधन ने स्त्रियों की मनःस्थिति चेतनाशून्य बनाकर उन्हें स्वयं पर लादे गए इस परम्परा के बोझ को उनकी नियति मानने को विवश कर दिया। साथ ही परम्परागत नारी के रूप में श्रेष्ठ स्त्री की छवि ही बदल गई, जिसका जिक्र होते ही हाथों मे हाँड़ी-बरतन लिए, आँखों में आँसू भरे, चेहरे पर घूँघट डाले, रसोईघर में चूल्हे के पास खड़ी मानवी का करूण चित्र उभरता है। जिसके दिन-रात गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने के बावजूद उसके कार्यों का कोई मूल्यांकन नहीं होता। इस तरह परम्परा, नैतिकता और आदर्श के ताने-बाने ने समाज का एक अहम् भाग होते हुए भी स्त्री की स्थिती को गौण बना दिया। यहाँ सीमोन द बोउवार का यह कथन ''स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है।'[1] न केवल तर्कसंगत प्रतीत होता है बल्कि हमारे तथाकथित परम्परागत समाज में जकड़ी स्त्री के अस्तित्व पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। किन्तु अब बदलते समय प्रवाह में स्थितयाँ भी वही नहीं रह गई हैं; मूर्छित पड़ चुकी स्त्री चेतना भी अब अपने नेत्र खोलने लगी है। उसने पुरूषों के षड्यंत्र को भी समझ लिया है। अतः उसे अब इन साजिश के तहत निर्मित पारम्परिक बेड़ियों में जकड़े रहना कतई स्वीकार नहीं। उसने अब इनसे मुक्ति के मार्ग तलाशने आरम्भ कर दिए हैं। जिसमें उसने सबसे पहले स्वयं पर लगाए इन बंधनों एवं अधिकार-वंचित स्थितियों पर सवालिया निशान लगाया है। समकालीन नारीवादी चिन्तक आशारानी व्योरा ने स्त्री की इसी प्रश्नांकित दृष्टि को रेखांकित करती हुए लिखा हैं, ''सृष्टि रचना में स्त्री का योगदान पुरुष के समान योगदान से कहीं ज्यादा है, वह मानव की जन्मदात्री है, फिर संसार के विकास में उसका योगदान क्यों नगण्य रहा?.....क्या वह दूसरे दर्जे की इंसान है? क्या वह केवल पुरूष-पति मन बहलाव करने की वस्तु है?उसका अपना निजी अस्तित्व अपनी पहचान कहाँ है?''[2] ये प्रश्न ही तथाकथित बेड़ियों को तोड़ने की ओर उठाया गया पहला कदम है। प्रस्तुत आलोच्य कृति 'कस्तूरी कुण्डल बसै' भी इन्हीं परम्परागत बेड़ियो से जूझती स्त्री की संघर्षगाथा है जो कि साहित्य की अन्य काल्पनिक विधा में सृजित न होकर बोल्ड कही जाने वाली आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, क्योंकि ''कहानी, उपन्यास लिखते हुए भी कुछ ऐसी पीड़ा या कसक शेष रह जाती है, जिन्हें लेखकवृन्द आत्मकथात्मक वृतान्तों में ही लिखने की

अनिवार्यता महसूस करते है। उन्हें लगता है कि उनके जीवन का यथार्थ कुछ ऐसा संघर्षशील अवश्य रहा है जिसे प्रस्तुत करना लेखकीय दायित्व है।''[3]।

प्रस्तुत आत्मकथा पारम्परिक जड़ता को तोड़ती उन माँ-बेटी की संघर्षगाथा है जहाँ माँ कस्तूरी वैधव्य भार से दबकर बैठती नहीं बल्कि स्त्री-मुक्ति संघर्ष की अगुआ बनकर ग्रामीण परिवेश के विरोधी एवं नकारात्मक तत्वों से टकराते हुए निंदा, उपहास की परवाह न कर शिक्षा को अपना हथियार बनाकर संघर्ष की पथरीली भूमि पर चलते हुए आत्ममनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। वहीं उसकी बेटी माँ से विद्रोह व संघर्ष को विरासत के रूप में प्राप्त कर अपनी माँ के ही थोपे विचारों के खिलाफ विद्रोह करती है, क्योंकि उसकी माँ के ये विचार उसे अपनी आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने में बाधक प्रतीत होते हैं। उसका वजूद उसे संकट में नजर आता है।इसी जद्दोजहद में वह माँ से मुक्त होकर एक नए कैद का वरण करना चाहती है,''माँ मैं भी एक साँकल तोड़ना चाहती थी, वह साँकल जिसकी छोर तुम्हारी हाथों में है।''[4] यहाँ माँ-बेटी के बीच वैचारिक मतभेद तो अवश्य देखा जा सकता है परन्तु संघर्ष के धरातल पर दोनों समान हैं। दोनों ही अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत हैं। क्योंकि आज मुक्ति के लिए संघर्षरत स्त्री का एक ही सपना है जो तसलीमा नसरीन के इन शब्दों में साकार हुआ है,''नारी यह दुनिया तुम्हारी है। इस दुनिया मे तुम अपनी इच्छा से जीओ। यह दुनिया यदि एक नदी है, तुम उस पूरी नदी में तैरती रहो। यह दुनिया यदि एक आकाश है, तुम पूरे आकाश में विचरण करती रहो। जीवन यदि तुम्हारा है जो दरअसल तुम्हारा ही है, तो वह जीवन तुम जैसी इच्छा हो-जीओ।''[5]

हमारे भारतीय समाज में रूढ़ि-परम्परा, कानून और धार्मिक विश्वासों पर केन्द्रित एक ऐसी परिवार व्यवस्था कार्यरत है, जहाँ सदियों से स्त्रियों की स्थिति आश्रिता के रूप में कायम रही है, जहाँ उनके समस्त अधिकार छीनकर उन्हें परम्परागत सीमाओं में बांधकर, खानदान के झूठे दम्भ को बनाए रखने के लिए उन्हें खाना-कपड़ा देकर घरेलु वस्तु मात्र के रूप में सीमित कर दिया गया, तथा जिनके सोचने-विचारने का मार्ग अवरूद्ध बना दिया गया। ऐसे क्रूर समाज व्यवस्था में शादी ब्याह की उम्र पार कर चुके व्यक्ति से ब्याही कस्तूरी द्वारा इन रूढ़ परम्पराओं को तोड़ने का साहस साधारण नहीं है। उनका यह साहस ससुराल में प्रथम प्रवेश के दौरान ही प्रारम्भ हो जाता है जब कस्तूरी ने मुँह दिखायी की रस्म में झटके से अपना घूँघट उलट दिया था। गोद में नन्हीं सी मैत्रेयी को छोड़ पति के स्वर्गवासी हो जाने पर विलाप न करने के एवज में 'कठकरेज लुगाई' का विशेषण पाकर भी वह दो टूक शब्दों में कह उठती है,''यह मेरे बस का नहीं है चाची, क्योंकि अब मैं अपनी जिन्दगी और बेटी की नन्ही जान को लेकर ही सोच पाती हूँ। मुझे लोग धिक्कार रहे हैं, पर कैसे समझाऊँ कि मेरे सामने आने वाले दिन बाघ की तरह मुँह फाड़े खड़े हैं।''[6] चूँकि हीरा की विधवा होने के नाते खेत पर कस्तूरी का ही अधिकार था। वह खेती-बारी के सहारे अपना जीवन-यापन कर सकती थी, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। वह ग्रामीण विधवा की परम्परिक छवि को तोड़कर अपनी नई प्रतिमा बनाने का निश्चय करती है, जिसमें शिक्षा से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि शिक्षित होकर ही स्त्रियाँ आत्मनिर्भर बन सकती हैं और आत्मनिर्भर होकर ही अपनी अस्मिता कायम रख सकती हैं। क्योंकि ''स्त्रियों की पराधीनता का मुख्य कारण उनकी आर्थिक पराधीनता है। परनिर्भरता के कारण ही उन्हें घर की चाहरदीवारी के भीतर रहकर अनन्त अत्याचार सहने पड़े।''[7]

मैत्रेयी की नजर में माँ की जो छवि है वह स्त्रीवादी सोच

की ही प्रतिमूर्ति है; जिसमें जहाँ एक ओर आत्मसजगता, अस्तित्वबोध और स्वावलम्बन की भावना है वहीं दूसरी ओर पुरूषों को अँगूठा दिखाने की जिद भी। इसी आत्मसजगता के कारण माँ कस्तूरी रूढ़िग्रस्त परम्पराओं से भरे समाज से विद्रोह कर स्वयं शिक्षित हो महिला-मंगल की सक्रिय सदस्य बनती है, वहीं अपनी बेटी को भी पुरुष बाहुल्य समाज में;जहाँ उसके लिए खतरे ही खतरे हैं। शिक्षित होने के लिए भेजकर रूढ़ मान्यताओं को भी तोड़ने का अदम्य साहस करती है। भले ही गाँव की स्त्रियों की छींटाकसी और बेटी की उपेक्षा का आरोप कस्तूरी पर लगते हैं, पर ये मर्मबेधी आलोचनाएँ भी उसके दृढ़संकल्प को डिगा नहीं पाते। बेटी मैत्रेयी भले ही समाज की कुदृष्टियों से आहत होकर हार मानना चाहती है, पर माँ उसे समझाते हुए कहती है,''ऐसे भागने से तेरा क्या बनेगा?......सामना करना सीखना होगा, ऐसे ही जैसे हम विधवा औरतें किया करती हैं। यह बात गाँठ में बाँध ले कि मर्द की जात से होशियार रहकर चलना होता है, भले ही वह साठ साल का बूढ़ा हो।''[8] इस प्रकार एक जिद्दी माँ स्त्री सशक्तिकरण की मशाल जलाते हुए अपनी बेटी को अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है अर्थात् पढ़-लिखकर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर पुरूषों की गुलामी से मुक्ति।

कस्तूरी, 21वीं सदी में उदित हो रही उन चेतना-सम्पन्न नारियों की पुरोधा है जो ''परिवार संस्था को चुनौती देती हुई, महत्वकांक्षा के सपनों को संजोती हुई, अपने नैसर्गिक विकास को अवरूद्ध करने वाली सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ती, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करती तथा स्त्रियों की पारम्परिक भूमिका से भिन्न खड़ी अपनी अलग ज़मीन तलाशती स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है।''[9] वह पुरूषों के एकाधिकार और वर्चस्व से स्त्री को मुक्त देखना चाहती है। यही कारण है कि वह विवाह जैसी संस्था के पक्ष में नहीं है। वह पुरूष मानसिकता के विषय में अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहती है,''इनको पता नहीं कि विवाह के बाद पति का पत्नी पर कैसा कब्जा होता है? क्या इनकी मर्जी के बिना इनके घर की औरतें चौखट के बाहर कदम रख सकती हैं?''[10] अपने असंतुष्ट वैवाहिक जीवनानुभवों के कारण ही वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी इस वैवाहिक जुएँ में उलझकर पुरूष की गुलामी करे। उसकी राय में बेटी को ब्याह कर गाय की तरह हाँक देने जैसा कोई दूसरा अपराध नहीं। इसीलिए वह मैत्रेयी पर भी कई तरह के अंकुश लगाती है, उसकी नैसर्गिक इच्छाओं को कुचलते हुए उसे स्त्री उत्थान में लगाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ संघर्षशील माँ का ही एक अंश है-मैत्रेयी। अतः विरासत में प्राप्त विद्रोही संस्कार से वह भी मुक्त नहीं है। फलस्वरूप अपनी माँ द्वारा लगाए बंधनों को तोड़ने के लिए वह भी अग्रसरित होती है और माँ की इच्छा के विरूद्ध अपनी स्वाभाविक वृत्रियों का दमन न कर अपनी विवाह की इच्छा को जाहिर करती करती है-''माँ तुम खफा क्यों होती? मेरी स्वाभाविक इच्छाओं को कठोर उपवास में मत बदलो। मैं अपनी इन्द्रियों को कसते-कसते दूसरों की हवस की शिकार हुई जाती हूँ।''[11] इस प्रकार मुक्ति के संघर्ष में मैत्रेयी भी पीछे नहीं रहती और अपनी माँ की ही प्रतिद्वन्दी के रूप में खड़ी हो जाती है। अंततः कस्तूरी ही हार मानकर विवाह के लिए वर ढूंढने निकल पड़ती है। यहाँ एक प्रकार से पुरूषों द्वारा लड़की के वर ढूंढ़े जाने की परम्परा भी टूटती दिखायी पड़ती है; किन्तु हमारे भारतीय समाज की परम्पराएँ इतनी क्रूर हैं कि कहीं कहीं कस्तूरी को भी दंश झेलना पड़ता है। उसे अपनी शिक्षित पुत्री के लिए वर केवल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वर ढूँढने एक महिला आयी है। लड़के का पिता कस्तूरी से कहता है-''पुरूष जैसे काम करने से पुरूष जैसी नहीं मान ली जाती स्त्री। सामाजिक कामों

के लिए उसे पुरूष की जरूरत होती है। भले ही वह पाँच या दो साल का हो।''[12] अंततः परम्परा और मान्यताओं के विरूद्ध जाकर कस्तूरी मैत्रेयी को अपने किसी संगी-साथी से विवाह करने की स्वतंत्रता तो अवश्य देती है पर उसके मन के किसी कोने में दबी परम्परावादी विचारधारा मैत्रेयी को जाति विरूद्ध जाने की अनुमति नहीं दे पाती। माँ द्वारा ही बनायी गयी परम्परा की इस कैद, जहाँ अपने मन के अनुरूप जीवन साथी का चुनाव उसकी जाति को देखकर किया जाए को मैत्रेयी स्वीकार नहीं कर पाती और इस कैद से मुक्ति की आशा लिए सोचती है,''वह कौन सा संसार है, जहाँ लड़की अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनती है? विश्वास अर्जित करने का अवसर पाती है।''[13] हमारे समाज में यौन-प्रसंग भी एक ऐसा मुद्दा है जिसे परम्परावादियों ने गोपनीय बना रखा है। किन्तु स्त्री-विमर्शों पर बात करते हुए स्त्रियों में अब यह साहस आ गया है कि अब वे समाज में गोपनीय रखे गए विषयों पर भी खुलकर बात करके समाज में अपनी रूढ़ लज्जालु छवि को तोड़ रहीं हैं। मैत्रेयी ने भी इस आत्मकथा में तथाकथित नैतिक एवं आदर्श समाज व्यवस्था के बीच पुरूष समाज की असंगतियों, स्त्रियों के प्रति उनकी वासनात्मक दृष्टि तथा स्वयं पर पुरूषों द्वारा किए गए यौन आक्रमणों को जिस साहस के साथ अभिव्यक्त किया, वह स्त्री के परिवर्तित हो रहे परिवेश का परिचायक है। उन्होनें बिना किसी लाग-लपेट के इस सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए लिखा,''सड़क पर ट्रक चलाने वाले ड्राइवर, गोश्त मण्डि का कासिम कसाई और डी0बी0 इण्टर कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक ने हाथ आजमाने की जुर्रत की थी।''[14] इस प्रकार मैत्रेयी ने जहाँ स्वयं पर हुए यौन आक्रमणों को खुलकर वर्णित किया वहीं स्वयं की यौनाकांक्षाओं को भी व्यक्त करने में पीछे नहीं रही हैं। सुहागरात में मैत्रेयी ने परम्परागत गुड़िया की भूमिका निभाने के बजाए स्वयं ही घूँघट उलटकर, सिकुड़ सिमटकर बैठे रहने के बदले खुद ही आगे बढ़कर सक्रिय हुई। जबकि परम्परागत विचारों वाले पति, जिसके मन में पत्नी की दासी वाली अवधारणा है इस आग्रह को संदेह की दृष्टि से देखता है। किन्तु मैत्रेयी को पति की यह उदासीनता स्वीकार नहीं होती और वह धिक्कार उठती है,''पहले बताओ कि मर्द की कूबत नहीं है तो ब्याह क्यों किया? हमने पार लगा दिया तो नखरे पसारने लगे।''[15] जाहिर है, यौन उत्पीड़न में ही आँख खोलने वाली मैत्रेयी में स्वायत्तता, समानाधिकार के प्रति स्वयं ही सजगता आ गयी हैं।

निष्कर्षत : स्त्री-विमर्श के नूतन धरातल को प्रस्तुत करती यह आत्मकथा पितृसत्तात्मक रूढ़ ढाँचे को तोड़ती दो ऐसी स्त्रियों की संघर्षगाथा है जिनमें पीढ़ी का अंतर और वैचारिक मतभेद होते हुए भी पितृसत्तत्मक व्यवस्था के विरूद्ध अस्मिता की लड़ाई में दोनों समान धरातल पर खड़ी दिखायी देती हैं। इनमें फर्क केवल इतना है कि माँ कस्तूरी का संघर्ष जहाँ बहिर्मुखी अधिक है वही बेटी मैत्रेयी का संघर्ष अंतर्मुखी हैं। कस्तूरी का संघर्ष जहाँ परम्परागत रूढ़ियों, संस्कृतिक-धामिर्क रीति रिवाजों, सामाजिक बंधनों तथा संरक्षण के नाम पर स्त्रियों को गुमराह करने वाले समाज के ठेकेदारों से है, वहीं मैत्रेयी का संघर्ष अपनी आन्तरिक इच्छाओं-आकांक्षाओं और स्वतंत्रता पर लगायी गई बेड़ियों के खिलाफ है। फलतः अंतर्मुखी होने के कारण मैत्रेयी का संघर्ष अपनी माँ की भाँति व्यापक फलक पर उभर कर हमारे सामने नहीं आ पाता। हालाँकि हम इन दोनों स्त्रियों को पूणर्तः आधुनिक भी नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें भी कई स्थलों पर परम्परानुगमन करते देखा जा सकता है किन्तु बावजूद इसके ये स्त्रियाँ आज के बदलते परिवेश के अनुरूप शनैः शनैः रूढ़ियों कों तोड़ती हुई स्त्री की परिवर्तित मानसिकता

को उजागर कर, पुरूषवर्चस्वादी रीति-नीतियों को तोड़ने एवं समानाधिकार लाने हेतु एक परिवेश अवश्य निर्मित कर रही हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि आज इन ''नारी मुक्ति आन्दोलन के समर्थक, समाज सुधारक और चेतना सम्पन्न नारी ने इस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह का बिगुल बजाया है। वह परम्परागत रूढ़ि-परम्परा का विरोध कर नारी को शोषण मूलक, अत्याचारी व्यवस्था के जंजालों से मुक्त करने का प्रयास कर रही हैं।''[16]

संदर्भग्रन्थ सूची:-

1. स्त्री विमर्श: विविध पहलू- सं डॉ0 कल्पना वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2011, पृष्ठ-234
2. औरत कल आज और कल- आशारानी व्योरा, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-184
3. उत्तरशती के उपन्यासों में स्त्री- डॉ0 शशिकला त्रिपाठी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2006, पृष्ठ-101
4. कस्तूरी कुण्डल बसै- मैत्रेयी पुष्पा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ-238
5. हिन्दी लेखिकाओं की आत्मकथाएँ- सरजू प्रसाद मिश्र, अमन प्रकाशन, कानपुर, 2011, पृष्ठ-27
6. कस्तूरी कुण्डल बसै- मैत्रेयी पुष्पा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ-28
7. स्त्री मुक्ति के प्रश्न- डॉ0 रामविलास शर्मा, गोदारण प्रकाशन, 2012, पृष्ठ-32
8. कस्तूरी कुण्डल बसै- मैत्रेयी पुष्पा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ-52-53
9. आजकल, सं-फरहत परवीन, मार्च 2014, वर्ष-69, अंक-11, पृष्ठ-24
10. कस्तूरी कुण्डल बसै- मैत्रेयी पुष्पा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ-63
11. वही , पृष्ठ-59
12. वही , पृष्ठ-72
13. वही , पृष्ठ-132
14. वही , पृष्ठ-91
15. वही , पृष्ठ-251
16. महिला आत्मकथा लेखन में नारी- डॉ0 रघुनाथ गणपति देसाई, ए0बी0एस0 पब्लिकेशन, वाराणसी, 2012, भूमिका से

ENGLISH, THE HUMANITIES AND THE INDIAN SCENARIO

Dibyajyoti Ghosh
Assistant Professor, Department of English

What is the relevance of the humanities in the twenty-first century? In a world increasingly influenced by computer algorithms, what relevance do the teaching and study of literarure, history and philosophy have? The study of languages is essential to making our way in the world, finding means to communicate. Yet not all languages find equal means of support. Languages are closely aligned with identity and thus also with identity politics. Hence, the teaching and study of languages is influenced by political discourse.

The teaching of literature, on the other hand, is affected by its link with language pedagogy. The teaching of 'canonical' literature has often been used as a tool for learning grammar, logic and rhetoric—the ancient trivium. Rather than learning for its own sake, the humanities started out as utilitarian in nautre, be it for the Mesopotamian scribes, the medieval European university guilds, or the civic humanists during the Italian Renaissance. Jens Hoyrup, in his book Human Sciences: *Reappraising the Humanities Through History and Philosophy* (Albany: SUNY Press, 2000) points out that it was only during the Italian Renaissance that rather than teaching extracts from literary texts for purposes of the trivium, entire texts were taught to students of the humanities.

The humanities have been seen as being in a crisis in America and the UK in two recent phases, first in the 1970s and 80s when several subsidies came to be withdrawn from public education, and again after the 2008 financial crisis, when the economy in general in these two countries went through a drastic fall and subsequent gradual rise. A decline has been seen in India as well. The Ministry of Human Resource Developments *All Indian Survey of Higher Education* for the year 2010-11 reported an undergraduate enrolment of 47% in the arts/ humanities/ social sciences whereas the 2018-19 report mentions 32.69% enrolment in such disciplines. The number of private institutes of higher learning in India is growing at a faster pace than government-aided institutes. Whereas 59% colleges were private, unaided in 2010-11. 64.3% are so in 2018-19. Private, unaided colleges offer more vocational courses than general courses. The humanities prepare students for a broader vocation. Whereas historically students of the humanities became scribes and civil servants, students of the humanities now find themselves without any definite career path. Hence, the unwillingness of private, unaided colleges to offer courses which do not have a unique selling point. Even then,

among the three major humanities subjects of history, philosophy and literature—English seems to hold some fascination for private, unaided colleges since the knowledge of the language English itself is seen to make graduates more employable.

In the US and the UK, rather than majoring in the humanities, students are having to take general courses in the humanities. It is assumed that some exposure to the humanities provides a broader education and such exposure is necessary to understand the human condition and go on to do work in other fields, such as Artificial Intelligence computer programming for instance, in a better manner. The humanities are being sold in other garbs of utilitarianism. Management students can become better managers if they study the humanities, computer programmers can write more humane and just algorithms, economists can understand society much better, etc. Learning for its own sake is not the concern while offering the humanities. It has historically also not been so.

Literature students are not told that they are signing up for a 'great books' reading course when they think of majoring in literature. The English course in India has more often than not in the last two hundred years of English literature pedagogy in India, been seen as a course where students can improve their knowledge of the language and get better jobs rather than as a 'great books' course with knowledge about the society which produced such literature. The introduction of race, class and gender in literature courses in the last fifty years was initially met with dismay among many scholars of the pre-1970s age. John. M. Ellis's Literature Lost: Social Agendas and the Corruption of the Humanities (New Haven: Yale University Press, 1997) decried the literature-as-a-mirror-of-society approach and tried to invoke the literature- as- being- restricted- to-the-text-only approach. The very reason why literature is now sold to young managers or computer programmers was met with contempt when in the 1990s literature departments found themselvse addressing issues of race, class, gender and social equality to a greater extent.

Indian students of English in the last few decades suffer from a double deception. Not only do they frequently not expect a 'great books' course when signing up for the literature course (the course is often titled just 'English' and not 'English language and literature' or 'English literature') but also scribal skills, such as grammar, logic and rhetoric which were part of the pre-modern humanities courses are replaced by a greater focus on using literature to understand society. Language skills and job training— two things which most students expect from the English course are generally missing. The subject 'Communicative English'

which some institutes of higher learning offer is often closer to what the students expect. However, the 'Communicative English' course bears little resemblance to the 'great books' course that the 'English' course has become.

The word 'human' in the word 'humanities' was meant to distinguish the humanities from religious studies. Whereas the humanities studied human beings and their methods of writing and talking, religious studies entailed studying religious canonical literature to understand God. It was only through insistence on academic rigour that scholarship in the humanities became pedantic and the intricacies of grammar, logic and rhetoric became more important than the end goal of such scholarship-to understand fellow humans better and to communicate with them in a more effective manner. Now that after the New Criticism of the 1940s of looking at a literary work in isolation as just a text, we have returned to looking at a text as mirror of society, we are again at a crossroads in English pedagogy in India. Should it cater to a) improving language skills, b) going through a 'great books' course by studying the texts in isolation, or c) use literature in order to improve social equality? Whereas employers often cite the importance of the humanities in making employees more attuned to social needs and hence providing better service to customers and creating better products, it is not unwise to claim that employers would be alarmed if their employees strove for greater social equality. A docile and pliable working population is a must for any employer. The humanities have a dangerous potential. However, in order to reach that potential students need to possess good language skills and have read through the 'great books'. Whereas reading through the 'great books' is designed into the curriculum, improving language skills are not. Thus, Indian students often suffer at the first crucial step which prevents them from successfully moving on to the next two steps of reading through several great books and imbibing that knowledge to understand and improve society. On the contrary, Indian students, at the end of a humanities course or an English undergraduate course, often find themselves unemployable for their lack of sufficient communication skills.

The solution to this problem for the English course is to have two clear sets of courses, a 'Communicative English' course for picking up language skills, and a 'great books of English literature' course for students already possessing the necessary language skills. Offering the latter, when students expect the former, leads to struggling students, disgruntled teachers and disappointed employers.

What is worse for Indian academia in general is that the lack of communication skills poses a barrier to the employability

of other majors as well. Indian industry has routinely lamented about the unemployablitiy of Indian graduates and higher education official have routinely tried to address this issue by integrating a few language courses in other majors. Language skills, however, are not easily remedied in a few classes. The school level is the appropriate stage for sustained years long language preparation skills. Shifting it to the other end of the education spectrum is like, as the saying goes, a band-aid on a gangrenous wound.

Other than language skills, the lack of adequate critical reasoning skills of humanities graduates is also routinely highlighted. However, language remains a barrier to overcoming this. Not only are students not well skilled in any language (be it English or other Indian languages) but also rote learning, from the elementary to the PhD level, is a short-cut to making one's way through formal education. Thus, though language prevents critical reading and critical writing, being accustomed to rote learning disincentivises critical thinking. Education policy makers routinely speak against rote learning. However, their actions move in the other direction. In India, recently the higher education regulator has come up with a one nation, one syllabus concept. As India moves away from its unity amidst diversity concept to a one size fits all monolith, education also is becoming more enmeshed in a uniform template for all students. The common syllabus across India presents the syllabus as a shared platform where navigation across it also encourages sharing of thought. Thus, students routinely leave their portion of the sharing to ready-made notes. Rather than encouraging individuality, such a system of education encourages herd mentality.

If the larger aim of the humanities is to develop critical thought in order to produce critical communication, individual thinking and individualism is to be encouraged. It is not surprising that the Italian Renaissance and its focus on individualism also marked one of the great paradigmatic shifts in humanities pedagogy. As india continues to move further away from freedom of individual expression, the *raison d'etre* of the humanities continues to shrink. When the thinking is left to the social and political masters and the writing to the social and political templates, the humanities move away from epistemological concerns to indoctrination.

CRYPTOZOOLOGY: SCIENCE OR FICTION

Pallab Ray

Assistant Professor, Department of Zoology

Since the beginning of human history, people have lived in close contact with animals-usually as hunters and farmers- and have developed myths and legends about them. All kinds of creatures, from fierce leopards to tiny spiders, play important roles in mythology and folklores. All around the globe and even in India, there have accidental sightings of creatures that science does not know about. Some sightings are merely the result of the illusion of the human mind but sometimes the eye witness accounts are too clear and reliable. It cannot be just dismissed.

Cryptozoology is a branch of science that aims to prove the existence of animal entities from the mythical record, such as Yeti, Lochness monster, Bigfoot, The Chupacabra. Cryptozoologists refer to these entities as cryptids,

The term "cryptozoology" itself was first coined in French-Belgian zoologist Bernard Heuvelmans and his colleague, Scottish zoologist Ivan T. Sanderson, who both wrote numerous books on the subject, such as Heuvelmans' groundbreaking work On the Track of Unknown Animals in 1955. Although the two were pioneers in the field, Heuvelmans himself would credit the term "cryptozoology" to Sanderson, who put together the Greek word kryptos, meaning "hidden," with zoology, which literally became the "study of hidden animals."

As for the term "cryptid," this word can most clearly be traced back to a September 1983 article in the International Society of Cryptozoology Newsletter, in which cryptozoologist J. E. Wall proposed calling these hidden creatures "cryptids." His rationale was explained for an overall term for such creatures being, "My suggestion is 'cryptid', meaning a living thing having the quality of being hidden or unknown."

New species which remain elusive, animals outside the normal parameters of what we know, beasts which are spoken of in myth, legend, and folklore which may be based on some real unknown animal, animals which do not appear to be similar to any known species, those which have been seen far outside of their known range or habitat, and creatures appearing with unexpected size, coloration or shape beyond the norm. Generally speaking, it is important that these mysterious creatures be "ethnoknown," an important term to remember, that is, the creature is known by the local population of the area in some form or other, yet has not been conclusively proven to exist in any meaningful way.

For instance, Native Americans and other cultures have various legends of hairy wildmen, so Bigfoot is an ethnoknown entity. This is very important as it is considered to be a key feature for an alleged unidentified animal to be considered worth pursuing in cryptozoology, in other words a true "cryptid." If it is only known from a handful.

of wild reports but not represented in any of the lore of the area's people, then it is likely not a cryptid, but something else entirely. Only very rarely is a new species identified by science which was not ethnoknown, one example being the Sumatran striped rabbit (Nesolagus netscheri), of the Barisan Mountains in western Sumatra, Indonesia. This animal is only known from photographs, sightings, and field observations, and is so rare and elusive that the natives of the area had no idea they even existed, having no name for the rabbit. In this sense it was a cryptid that was not ethnoknown, but this is by far the exception rather than the rule.

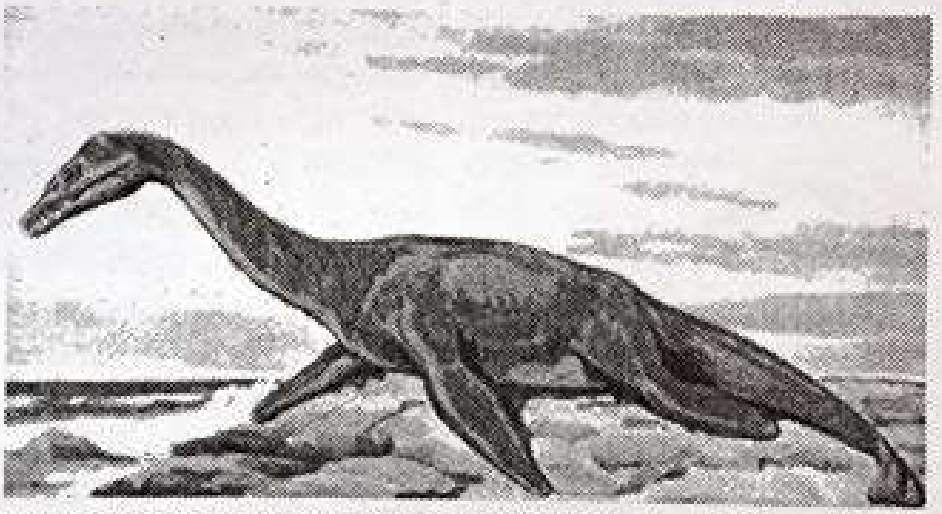

Figure: Artist's impression of monster from lake Loch Ness, Scotland

India too has many cryptids as locals reported. In the marshlands of the Ziro Valley in Arunachal Pradesh, the Buru roamed around. Buru, a reptile like creature that was spotted quite commonly in the Ziro Valley. Burus were as big as crocodiles and would often prey on the humans. In 1947 Austrial researcher Professor Christopher von Furer-Haimendorf went in search of the Buru but it is believed that the reptile was already extinct by then. Scientists believe that the Buru was an unknown descendant of the reptile kingdom that was endemic to that region of Ziro Valley. Due to the man beast conflict, either the Buru has gone extinct or has receded deep into underground cave systems.

Cryptozoology is not about proving the paranormal or "monster hunting." Cryptozoologists really don't think that they are going to find an actual dragon just as described in fairy tales and myth or an actual unicorn as commonly depicted as a strapping stallion with a single horn. At the end of the day, cryptozoologists are looking for a potentially real, biological entity behind all of the stories, myths, folklore, and sightings accounts. Indeed, a good many known animals were

portrayed in a mythical or magical way before their discovery and even after.
In the late eighteenth century, British scientists had their first look at a Platypus specimen, sent from Australia, and many believed it to be a hoax. "It naturally excites the idea of some deceptive preparation by artificial means," English zoologist George Shaw wrote in 1799.
It makes the point that the Komodo dragon, the Okapi, the Manatee, the Platypus and even the Gorilla were at one time considered to be mythical beasts.

Further Reading:
Abominable Science! Origins of the Yeti, Nessie, and Other Famous Cryptids by Donald Prothero and Daniel Loxton, Columbia University Press. 2013.

CONSERVATION OF NATURE: THE STORY OF BHUTAN

Sounak Dutta

Assistant Professor, Department of Chemistry

With the advent of human civilization, Science has played a major role in shaping our life. As the saying goes. 'Necessity is the mother of invention', the desire for a better 'daily life' has initiated the engineering of a number of versatile machines, making our living smoother. The endless list can vary from a minute safety pin to a huge crane that can move almost anything. It includes the most primitive discoveries such as the first spark of fire and the recent ones such as electron microscopes to see the ultra small world around us. To be precise, Science is connected with each footstep of civilization.

However, in current perspective the question whether science is a boon or a bane is quite relevant. Urbanization is the main motto at the present era which threatens to decrease the greenery to a significant extent. As a gross result, the importance of our connection with Nature is apparently ignored. In the age of nuclear missiles, increasing industrialization and high energy atomic reactors coupled with simultaneous deforestation, global warming and deterioration of climate is becoming quite unavoidable. And however bitter it is, still we have to accept that human beings have destroyed Nautre in the name of 'urbanization and developent.' Local extinctions of different plant and animal species are being caused[1] due to climate changes. The obvious question that arises is, 'What is the remedy and how can we regain the balance with Nature, living with harmony with Her?' The answer to this question might be 'Sustainable Development'[2]. However answering the question is one thing and practically demonstrating it in real life is another uphill task.

The basic idea of Sustainable Development is meeting human development goals while sustaining the ability of natural systems and ecosystems.[2] The idea is quite simple: using natural resources and reducing pollution. And in recent times, this is measured by being 'Carbon Neutral'[3]. Let's describe the idea in a more detailed manner. Each individual human being (or for that matter each community or each town) produces a definite amount of carbon emissions (known as carbon footprints in teachincal terms). For example, a person would directly produce carbon dioxide by burning firewood to cook his food. Indirectly he can add to this by several ways. Driving cars, flying in airplanes, buying electronic devices, and even eating meat... all of this adds up to your personal carbon footprint, i.e... your contribution to the existing environmental crisis.[4] **Now coming in terms of contributions**

from each country. China, quite expectedly has the largest carbon by Sana Munawar, July 2016, A Publication of the Climate Institute. footprint (10.5 million kilotons of greenhouse emissions) which is approximately one-fourth of the global carbon footprint. India is ranked fourth producing 2.3 million kilotons of green house gases which is significantly large taking into consideration that India is still a developing nation and industrialization is still in progress![4]

So understandably, all countries have realized that the primary step is perhaps to bring down this carbon footprints to minimal and compensating carbon emissions by actions such as (1) planting enough trees which can utilize the carbon dioxide produced, and (2) using renewable source of energy in place of fossil fuels (coal, petroleum etc.) so that equivalent amount of carbon emission can be prevented (i.e. becoming carbon neutral.)[3]

In this aspect, when powerful giants of the world are struggling to become carbon neutral, a tiny country, Bhutan, a small country sandwiched between two economic giants (India and China) has quietly done a wondrous job.(4-6) Statistically, Bhutan's carbon footprint is only 2.2 million tons of CO_2, but interestingly, Bhutan has 72% of its land under forest cover. It has ample greenery that the country has become a carbon sink for 6 milion tons of CO_2! Therefore, while no other country has even achieved becoming carbon neutral, Bhutan has managed to be carbon-negative! (4-6) In his TED talk in 2016, Prime Minister and environmentalist **Tshering Tobgay** described the journey of attaining this status.[5] He described how natural resources are used to generate energy which is not only used in the country but also exported to neighboring areas, thereby offsetting huge carbon emissions. *So, it is actuality acting as a net carbon sink which can compensate emissions.*

Figure 1: Pristine Natural Beauty of Bhutan

Bhutan is also unique in the fact that they give importance to the idea of *Gross National Happiness* (GNH) over *Gross National product* (GNP). The Bhutanese people don't believe that any kind of economic growth is justified unless it goes hand-in-hand with the values and culture of the country (4-5) Also, they remain faithful to their values, culture and the promise not to destroy the forest cover. Some steps(4) that have been taken by the Government to implement carbon neutrality (or *negativity*) are:

1. Free Electricity-The Bhutanese government provides free electricity (produced from fast flowing local rivers) to its farmers to curb burning of firewood which would otherwise produce a lot of green house gas.
2. Environmental subsidies-Bhutan subsidized LED lights, which are more environment friendly. It is also in partnership with Nissan to encourage the use of electric cars in the country through subsidies.
3. Protected Areas-Most of Bhutan's forest cover falls under protected sanctuaries. There are strict rules against poaching, hunting and pollution in these areas. Not only that, but the government also supports the communities who live in those national park to lead dignified and prosperous lives.
4. Biological corridors-The government has created biological corridors that connect these protected areas to each other. The broad diversity of animals therefore freely roams throughout the country! It helps them adapt better and naturally augments their populations.

So, the government has made an effort to build national highway for animals to travel from one end to the other, and we still think of caging them!!

Even maintaining its cultural heritage, natural resource and beautiful monasteries, Bhutan has reacted to the climate change problems in the most positive way. Of late it has become a major biodiversity hotspot thereby attracting tourists from around the globe. So, basically Bhutan has become a model in conservation of Nature. Encouragingly many countries like Canada, Costa Rica, Iceland and several others have followed it and pledged that in a stipulated time, they will become carbon neutral.(3)

Development of a civilization is something obvious. With time, we will advance and science will keep contributing, as it has. But one undeniable truth is we need to maintain a balance between human development and Nature. The disturbance of this balance will create natural disasters like earthquakes, landslides and flash floods and eventually threatening existence of human race. 'Conservation of Nature' is as important as 'scientific advancement'. The terms are not contradictory but ideally complementary and go hand-in hand. Bhutan, even being a small country which remains almost unnoticed in the geographical map has shown the world a bright ray of light by becoming *'carbon negative'*. Now it is high time that the other countries follow this light!

Acknowledgements re Ms Subhalakshmi Paul for sharing pictures of Bhutan.

Notes and references:

1. www.climatechangenews.com
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_neutrality
4. https://en.www.scienceabc.com/social-science/ carbon-negative-country.html
5. www.ted.com
6. 'Bhutan improves Economic Development as a Net Carbon Sink' by Sana Munawar, July 2016, *A Publication of the Climate Institute.*

Yoga & You

Prabir Das
Gym Instructar

We all are aware of our health and we try to keep ourselves healthy, but the problem is how to keep our body fit. In modern times, we are running a rat race and it is very difficult to find time for ourselves. Everyday we decide to start working out from the next morning but we do not rise early and so we cannot start our workout. As a result, we are suffering from different diseases. The only remedy is physical Exercises. Now we have to decide how we will prepare our workout routine. Physical excercise can be done in different ways. Standing from morning walk to Multigym or yoga.

But yoga is a practice which anyone of any age can perform. Your age may be 8 or 80, it does not matter to practise yoga. There are several yoga Postures which help us to keep ourselves fit. There are some basic postures like lotus posture, Thunder posture, Butterfly posture which everyone can perform. There are some Pranayama which are common for everybody like Anulomvilom, kopalvati, Mindica or Bhamri. Today I will discuss about the breathing exercises which we can practise anywhere and anytime to keep us fit and fine.

There are five types of breathing named:

1. Normal Breathing or Ujjayi
2. Deep Breathing
3. Clavical Breathing
4. Internal Breathing
5. Abdominal Breathing.

Now we will discuss how to practise these Breathing exercises.

1. **Normal Breathing or Ujjayi:** Sit sukhasana or padmasana, now put your hand beside you. Then slowly prolong inhalation with hands up & join your palm. Now slowly prolong exhalation with hands down & put your hand beside you.

2. **Deep Breathing:** Sit Sukhasana or Padmasana now cross you finger, join your elbow, touch your finger under your chin and little bit bend your body. Now slowly prolong inhalation moving your elbow up and slowly prolong exhalation with moving your elbow and bend up your body.

3. **Internal Breathing:** Sit Sukhasana or Padmasana, put your palm on your ribs and breathe in-and breathe out from your indicated position. Now slowly prolong inhalation and slowly prolong exhalation.

4. **Clavical Breathing:** Sit Sukhasana or Padmasana, put your finger on your collarbone and move your elbow down. Now prolong (slowly) inhalation while moving your elbow up parallelly and slowly prolong exhalation while moving your elbow down.

5. **Abdominal Breathing:** Sit Sukhasana or Padmasana, put your palm on your abdomen and breathe in and breathe out from indicated position. Now slowly prolong inhalation and slowly prolong exhalation.

These exercises can keep different diseases away. So if we want to keep ourselves fit and fine, We should start practising yoga as soon as possible.

"KARO YOG, RAHO NIROG"

MOTHER CAN MAKE A DIFFERENCE

Naru Gopal Roy
Non-teaching staff

Once there was a boy trying to study. It was very difficult for him to continue with his studies. After spending some time he decided to quit studying as he was not able to understand anything. He went to his mother who was busy in the kitchen. The boy turned up in the kitchen and said to his mom, "I do not want to study, I don't get anything, it's of no use for me." His mother wanted to help him out but she was illiterate, but still she knew the value of education. She asked him to read again. The boy obeyed his mother's words. He read it and came back and said again, "I didn't get anything." His mother said, "Try to read it once again". He read it again and again. Then, he said, "I couldn't understand." His mother told him again and again. After reading several times the boy was able to understand. This shows that how small effects help in achieving big things. This shows how a mother helps her child despite many problems. That boy was no other than the former President of the U.S.—Barack Obama. In this way, my mother helps me and my brother to achieve success.

I HAVE SEEN IT

Subhodeep Chakraborty
B.Com (H)

I have seen the throne covered in blood
I have heard the screams from the flood
I have seen my hands in red
I have seen my father, fallen cold and dead.

Comrades of mine, with whom
I have walked on the revolutionary roads
Are now buried under the soil of mine
I have seen the graves, braves, numbers in nine.

But what does it all cost me now
Burning the great king alive
Bringing the revolution back to life
Was it worth all my people? All the lives?

Sometimes I wonder, if we didn't try
If we didn't dare to die
All the deaths I have seen, all the people I can't denie
I have seen the pity of war, I have seen it with an eye.

I have seen children crying to be fed
I have seen mother seeking for her child
I have seen torn out hands and ripped off souls
The disaster of the tears I cannot control.

To whom am I going to answer?
To whom I'll show my tears?
My comrades, my people are lying in front of me
Fallen cold and dead.

HAIR FALL

Ananya Chakraborty
English (H)

I heard people talk about receding hair line, hair fall issues, narrowing of the hair, burning of scalp, dandruff and so on. The issues never seem to end, if resolved, new one emerges soon. Simply speaking, if it's such a bother, why keep it? Isn't bald cool? Isn't it more comfortable? At least your main problem is gone.

Since birth, I never worried about my hair. Mom first told me, "You have the most beautiful hair I have ever seen dearie." I was surprised by the sudden compliment which I didn't even work for, but soon forgot such trivial matters. As a kid who never saw the world, I was busy exploring the unseen beauties and wonders. The banyan tree at the back of the school, pet dogs in my neighbourhood, the sassy yet sweet little kitties and cats, birds flying through the sky freely. Didn't we all think of being as free spirited as birds are at some point?

When I was a kid, I never realized, never even thought of it-my hair. I knew I had something different and cool, something amazing but never bothered about it because what's the point of being all concerned about small things? Don't I already have it? I was obsessed with something attractive and huge. Was I the only one?

As I grew a little, I still didn't care. Rather, I had nothing to worry, nothing to do, just playing, roaming around and exploring new things. I never bothered to know about my hair. Weird? Yes and no, both for me. Yes, because why will someone not pay attention to their hair? It's your hair, that's literally a part of you. No, because I never cared for, never thought of thinking of such a small issue at such a young age. And I already had that thing. Hair is not human or bird. It surely won't walk or fly away.

After growing up a bit-starting of my adolescence-I paid attention. Well, not really, does looking at yourself in the mirror and accepting praises and compliments gladly for your hair counts? I did that. At least, I took a few glances at the thing I never paid attention to. It was a huge thing back then. Just imagine trying to taste your least favourite vegetable. I hope you scrunched up your nose in disgust.

Again, a few years later, a girl around 16 or 18, thick black hair that is smooth to touch and looks shiny, the type that attracts everyone, that was my hair and that girl was me. I was proud of it. My mom used to tell me, "Honey, take care of your hair." I always replied in annoyance or disgust. "It's not gonna rot like dead bodies, duh!" I remember my mom gasping or getting overwhelmed with emotions and scolding me. I didn't think much of it. Life continued. I was busy with studies, the changes around me, new world and so on. I slowly realized the younger me was the happiest. There was nothing to worry or stress about. Although I wasn't an adult yet, I was still suffering. Tension, panic, fear, loss, unfathomable thoughts

and emotions, joy, misery, betrayal, love, hatred. The list doesn't seem to end. I failed to recognize something-my hair was losing something. After being uncared for so long, I was thinking of giving up. But I still didn't pay too much attention. Combing my hair everyday once, tying my hair into a ponytail, bun, or braiding my hair into a long one or two on either sides of my head. That's what I did at most.

After finishing my school life and entering college, I realized the world I saw before was small. I, a young blood, filled with passion and determination worked hard to achieve success. At the end of the day, this is what matters the most. I met people and made new friends, though I was hesitating at first. At the end of my school life, I was already a loser. I lost almost all of my friends and close ones. It was tough opening up again. At this point. I started trying different styles. I wanted to look unique. I went to salons with my friends and got my hair styled to look beautiful and unique. Everyone did it, I wanted to try as well. Hearing their praise, I became happy. With the beauty standards for girls, I was busy trying to look beautiful. Makeup, dresses, shoes, heels, hairstyles, jewellery, colours, accessories, and so on. There was no end to it. Slowly, I turned desperate.

As I grew older, I wanted to be known. I was desperate for attention. I used highlighters and used to colour my hair often. People use to look at me. I use to search for ways to become unique, to become special, to become important and precious. And being reckless worked. But not for too long. I realized I was being immature and stupid. There was a time when a sentence that my mom used to utter quite often popped up out of nowhere. There's this famous Bengali proverb which means, not paying attention to things you had before and now repenting and regretting because you don't have it anymore. That moment should have made me realize my mistake, but I ignored it. I did something wrong.

I finished with my degree courses. In the meantime, I was dating someone. We soon got married and then became busier. At this point in my life, I was starting to look for ways to keep my hair healthy. But I was too busy and tired. I already entered the phase which no one considers as their prime. I was getting worried about myself, about my hair. There's a thing that we all hear a lot. Hair fall is caused by excess stress and tension. I was suffering through it now. Because of tension and stress, I was losing hair. Also, because of my hair fall, I was getting freaked out. In simple words, both my stress and hair fall had an increase suddenly. I tried to communicate and express myself, but never got a proper answer. No one paid attention to such a huge issue! Everyone said, "Isn't it normal? Why are you overreacting?" So, I suffered in silence.

Years later, I let go off improving my appearance. After giving birth to my adorable kids, I didn't have time for anything else. There were weeks of sleepless nights. I wasn't young and beautiful. I had wrinkles on my face, my skin looked old. I realized I wasn't beautiful anymore. It was a major blow to me. Society already brainwashed

everyone into following and being same in the name of being unique and different. I was a fool who blindly followed everyone. I realized this, but things couldn't be changed anymore. Instead of being a beautiful butterfly, I resembled moth.

My life continued. My kids grew. I saw them doing the same mistakes and nagged them until they decided to leave home. They never listened to me. I was helpless. Watching my kids commit the same mistakes in front of my own eyes was too much for me. But I hoped they will understand things one day. And they did, when I was no more.

At the age of 47, I almost turned bald. I didn't like this feeling. I had sleepless nights. My long beautiful hair, the hair that I lived for, the hair I was proud of, it was falling at an unimaginable rate. Watching my condition would have freaked you out or traumatized you. Three years later, I heard something that broke me completely. I had cancer. The doctor told me I didn't have much time left. But I still had a lot to do. I went for chemotherapy and other treatments. I remember how my hair was cut and shaved. I looked at the mirror, saw my reflection and broke into tears. The hair I treasured was no more. I lost something again. I never realized just how important my hair was to me before this incident. I became dispirited; my husband and children tried to help me out. Slowly-slowly I came out of my cave, but I wasn't the same person anymore. I changed with time.

As I grew older, I realized my mistakes, my childishness, my stupidity. I grew wiser. I didn't care to fit into the society like before, I became calm. I was not the obsessed or flamboyant lady anymore, I was a wiser woman living the later half of her life. I paid attention to myself and my mental state. I felt disappointed with my past self. Four months later, I lost my mother. Before leaving me forever, she cried. She said something to me which affected me a lot. She said in her hoarse, almost whispering voice, "I feel guilty. I couldn't protect you. I failed to guide you."

I realized I lost the two most important treasures: my mom and the uncared hair. As a cancer patient, I was busy with treatments and helping fellow patients. We ended up making an association of our own. I used to do my best to help people. I used to sit quietly and enjoy the peace. I learned to appreciate the world. Peace and silence are two languages themselves. I understood different truths of life, realized the value and importance of people and things that I failed to realize before, cared for the real me and accompanied my husband. But I didn't live long. I died after a few days of realizing things. Like hair, I was no more. It took me my whole life to realize some simple things. I was unique since the very beginning, but tried to go through treatments to become different and unique. I took too long to understand a single sentence. But that's what life is all about.

WHAT IS LIFE?

Subhodeep Chakraborty
B. Com (H)

Life's been like the toughest question to many philosophers and world influencing people and they have been seeking for the same answer as I do... What is life? I've been asking the same question over and over again, to the wise people and the stupid people, to the rich people ones and the poor ones. And it was all different, different from each other, partially right, partially wrong. The wise say, finding yourself; stupid say, enjoy what you love. Rich say, the success; and the poor says, PAIN...

You see. I've seen people from birth to death. I've seen them, fighting for their identities, I've seen them fighting for their existence. And I've seen people dying for their love, for what they have lost in life. I wonder, how much amount of pain does it take to end your own life, how much amount of courage takes to live a miserable life, still fighting and struggling. Is there any chance that all the people who end their own lives bear the same amount of pain as others? As death is the ultimate destination of life, just the only difference is the path you're in, the circumstances you're in...

Sometimes I think, what might be in their mind when people attempt to suicide. Life must be painful or the pain will end through the hand of death or something like that? But have they ever thought that in the world of over seven billion people, their death won't matter much, except to their loved one, unless... Unless they just manage to have a little bit of courage to fight and to wait for the end. Who knows, they might change the world for good.

After all, life is like a video game, a huge game with advanced software where you grow old and the level change and where your life changes according to the choices you make, according to the steps you take, doesn't matter how little or how big it is, it surely affects your life, in a way one or another.

As Mae West said, "You only live once, but if you do it right, once is enough".

SAVE TREES, PLEASE

Mahi Shaw
B.Com

If you want some soothing breeze,
Sow more seeds, grow more trees;
This will make the planet cool,
This will make it pollution-free.
If you want a longer life,
Sow more seeds, grow more trees;
This will give you air to breathe,
This will give you shade to rest.
If you want a better world,
Sow more seeds, grow more trees;
You will live a care-free life,
Floods, droughts and tsunami free.

CHERRY & JERRY

Sankalp Anand
English (H)

Cherry & Jerry are rhyme,
Me & you are prime.
Hot & cold are opposite,
Let us make a love deposit.
Vapour & ice are different,
Let us make a secret.
Truth & dare is a game,
Let us make a love name.
Time & wine is precious,
Let us make a day auspicious.
Cherry & Jerry are rhyme.
Me & you are prime.

THE ESSENCE OF LOVE

Ananya Das Gupta
Zoology (H)

My dear ones, love everyone
For love knows no bound.
A quality so heavenly blessed.
A feeling which is so immaculate.
A deed which is truly undaunted.
Love is not to be bought or sold
A gift of God which our hearts behold
Which unseen, arises spontaneously
From within, and then pervades everything.
Nothing is superior to money and love
Every deed loses power in front of love.
Love brings happiness; love brings sorrow
It reigns supreme today and tomorrow.
Love never die; on Heaven or on Earth
For it is truth and it is beauty
That makes a complete Man.

Design & Print by SKG Media